অদ্ভুতুড়ে সিরিজ

বিপিনবাবুর বিপদ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

বিপিনবাবুর বিপদ

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিজের দুঃখের কথা ভাবলে বিপিনবাবু বেশ আনন্দ পান। যখনই ভাবেন, আহা আমার মতো এমন দুঃখী আর কে আছে, তখনই তাঁর চোখ ভরে জল আসে এবং মনটা ভারী হালকা হয়ে যায়। আর সেজন্যই বিপিনবাবু নিয়ম করে দুবেলা ঘরের দরজা-জানলা এঁটে বসে নিজের দুঃখের কথা ভাবেন । ওই সময় বাড়ির লোক তাঁকে ভুলেও ডাকে না বা বিরক্ত করে না ।

মাঘ মাস । নফরগঞ্জে হাড়-কাঁপানো শীত পড়েছে। সন্ধের পর আর রাস্তাঘাটে মানুষ দেখা যায় না। কুকুর-বেড়ালটা পর্যন্ত পথে বেরোয় না। বিপিনবাবু নিজের ঘরে বসে একখানা ভারী বালাপোশে সবাঙ্গ ঢেকে খুবই আনন্দের সঙ্গে নিজের দুঃখের কথা ভাবতে শুরু করেছেন। ভাবতে-ভাবতে চোখে জল আসি-আসি করছে। মনটা বেশ হালকা হয়ে যাচ্ছে।

এই সময়ে বাইরে থেকে খনখনে গলায় কে যেন ডাকল, বিপিনবাবু, আছেন নাকি? ও বিপিনবাবু...

বিপিনবাবু ভারী বিরক্ত হলেন। এই শীতের সন্ধেবেলা আবার কে এল? গলাটা তো চেনা ঠেকছে না ! দুঃখের কথা ভাবার বারোটা বেজে গেল। বিপিনবাবু হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে উঠে দরজা খুলে বাইরে অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে বললেন, কে? কে ডাকছে?

আজ্ঞে, এই যে আমি ! বলে অন্ধকার থেকে একটা লোক এগিয়ে এসে বারান্দায় উঠল।

হ্যারিকেনের আলোয় যেটুকু দেখা গেল তাতে মনে হল, লোকটি খুবই বুড়োমানুষ এবং বড় রোগা। মাথায় বাঁদুরে টুপি, গায়ে একটা লম্বা ঝুলের কোট, হাতে একখানা লাঠি।

বিপিনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, কোথা থেকে আগমন হচ্ছে?

খনখনে গলায় লোকটি বলল, বলছি মশায়, বলছি। কিন্তু শীতে যে হাত-পা সব কাঠ হয়ে গেল। একটু ঘরে ঢুকতে দেবেন তো !

দিনকাল ভাল নয়। উটকো লোককে ঢুকিয়ে শেষে বিপদ ঘটাবেন নাকি? রোগা বা বুড়ো হলে কী হয়, হাতে লাঠি তো আছে। তা ছাড়া বাইরের লোককে ঘরে ঢোকাতে অন্যরকম আপত্তিও আছে বিপিনবাবুর। তিনি বিখ্যাত কৃপণ। তাঁর বাড়ির পিঁপড়েরাও খেতে না পেয়ে চিঁচিঁ করে। এমনকী, এ-বাড়িতে কুকুর-বেড়াল

নেই, কাকপক্ষীরাও বড় একটা আসে না। বাইরের লোক এলে পাছে লৌকিকতা করতে হয়, সেই ভয়ে বিপিনবাবু বাইরে থেকেই সাক্ষাৎপ্রার্থীকে বিদেয় করে দেন। লোকে বিপিনবাবুকে চেনে, তাই আসেও না বড় একটা। বিপিনবাবু তাই দরজা আটকে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি ব্যস্ত আছি। সংক্ষেপে যা বলার বলুন।

বিপিনবাবুর ঘোরতর সন্দেহ হল, লোকটা মেয়ের বিয়ের জন্য সাহায্য বা ছেলের বই কেনার টাকা না হয় ওরকমই কিছু চাইতে এসেছে।

লোকটা কিন্তু বড় সোজা লোক নয়। দরজা জুড়ে দাঁড়ানো বিপিনবাবুকে একটা গুতো মেরে সরিয়ে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, ওরে বাবা, এই শীতে কুকুর-বেড়ালটা পর্যন্ত পথে বেরোয়নি, আর আপনি এই বুড়োমানুষটাকে ঘরে ঢুকতে দিচ্ছিলেন না, অ্যাঁ ! লোকে যে আপনাকে পাষণ্ড বলে তা তো এমনি বলে না মশায় !

লোকটা বুড়ো হলেও হাতে-পায়ে দিব্যি জোর। কনুইয়ের গুতো বিপিনবাবুর পাঁজরে এমন লেগেছে যে, তিনি কঁকিয়ে উঠে বুক চেপে ধরলেন। তারপর খেঁকিয়ে উঠে বললেন, কে আমাকে পাষণ্ড বলে শুনি !

এখনও বলেনি কেউ? সে কী কথা! নফরগঞ্জের লোকেরা কি ভাল-ভাল কথা ভুলে গেল?

বিপিনবাবু খুবই রেগে গিয়ে বললেন, পাষণ্ড বললে তো আপনাকেই বলতে হয়। কনুই দিয়ে ওরকম গুতো যে দেয় সে অত্যন্ত হৃদয়হীন লোক। বুড়োমানুষ বলে কিছু বলছি না, তবে

লোকটা একটা কাঠের চেয়ারে জুত করে বসে হাতের লাঠিটা চেয়ারের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রেখে বলল, কী বললে, হৃদয়হীন? বাঃ, এ-কথাটাও মন্দ নয়। তবে গুতোটা না দিলে তুমি তো আর আমাকে ঢুকতে দিতে না হে বাপু! তুমি আমাকে না চিনলেও আমি তোমাকে খুব চিনি। তুমি হলে হাড়কেপ্পন বিপিনবিহারী রায়। তোমার বাড়িতে ভিখিরি কাঙাল আসে না। খরচের ভয়ে তুমি বিয়ে করে সংসারী অবধি হওনি।

বিপিনবাবু এসব কথা বিস্তর শুনেছেন, তাই ঘাবড়ালেন না। বরং খাপ্পা হয়ে বললেন, বেশ করেছি হাড়কেপ্পন হয়েছি। কেপ্পন হয়েছি তো নিজের পয়সায় হয়েছি। আপনার তাতে কী?

লোকটা মৃদু-মৃদু মাথা নেড়ে বেশ মোলায়েম গলাতেই বলল, তা অবশ্য ঠিক। তুমি কৃপণ তো তাতে আমার কী যায়-আসে। তবে বাপু, সত্যি কথা যদি শুনতে চাও আমি একজন পাকা কেপ্পন লোকই খুঁজে বেড়াচ্ছি। কাউকে তেমন পছন্দ হচ্ছে না। এই তুমি হলে তেরো নম্বর লোক।

বিপিনবাবু দাঁত কড়মড় করে বললেন, বটে! তা কেপ্পন দিয়ে কী করবেন শুনি! কেপ্পনদের ফলারের নেমন্তন্ন করবেন নাকি?

ওরে সর্বনাশ! না না হে বাপু, ওসব নয়। একজন পাকাপোক্ত কেপ্পন আমার খুবই দরকার। কারণটা গুরুতর

বিপিনবাবু একটু বুক চিতিয়েই বললেন, শুনুন মশাই, কৃপণ খুঁজতে আপনি খুব ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন। আমি কস্মিনকালেও কৃপণ নই। একটু হিসেবি হতে পারি, কিন্তু কৃপণ কেউ বলতে পারবে না আমাকে। আমি রোজ সকালে মর্তমান কলা খাই, বাজার থেকে ভাল-ভাল জিনিস কিনে আনি, বছরে একজোড়া করে জুতো কিনি, আমার তিনটে ধুতি আর তিনটে জামা, দুটো গেঞ্জি আর একখানা আলোয়ান আছে। কৃপণ হলে হত এত সব? এবার আপনি আসুন গিয়ে। আমার এখন অনেক কাজ।

লোকটা বাঁদুরে টুপির ফোকর দিয়ে ফোকলা মুখে একটু হেসে বলল, মর্তমান কলা তো তোমার গাছেই হয়। যেগুলো কাদি থেকে খসে পড়ে সেইসব মজা কলা বাজারে বিক্রি হয় না বলে তুমি খাও। বাজারের কথা বললে, শুনে হাসিই পেল। বাজারে তুমি যাও একেবারে শেষে, যখন খদ্দের থাকে না। দোকানিরা যা ফেলেটেলে দেয় তাই তুমি রোজ কুড়িয়ে আনো। জুতো তুমি কেনো বটে, কিন্তু সে তোমার এক বুড়ি পিসি আদর করে তোমাকে কিনে দেয়। তোমার তিনটে জামা আর তিনটে ধুতির কত বয়স জানো? পাক্কা ছবছর। আর গেঞ্জি দুটো ঘরমোছার ন্যাতা করলেই ভাল হয়। যাকগে, কৃপণ বলে নিজেকে স্বীকার করতে না চাইলে না করবে। কিন্তু স্বীকার করলে আখেরে লাভই হত। মেলা টাকাপয়সা এসে যেত হাতে।

টাকাপয়সার কথায় বিপিনবাবু ভারী থতমত খেয়ে গেলেন। টাকাপয়সা ব্যাপারটাই তাঁকে ভারী উচাটন চনমনে করে তোলে। তিনি রাগটাগ ঝেড়ে ফেলে একটু নরম গলায় বললেন, তা মশাইয়ের নামটা কী? কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

বুড়োমানুষটি ফোকলা মুখে ফের একটু হেসে বলল, এই তো দেখছি ঠাণ্ডা হয়েছ। বলি বাপু, খামোখা মাথা গরম করে এত বড় দাঁওটা ফসকালে কি ভাল হত? যে তেরোজন কেপ্পনকে বেছেছি তাদের মধ্যে জনাতিনেককে আমার বেশ পছন্দই হয়েছে। তবে বাপু, অত ধনরত্বের দায়িত্ব তো আর যাকে-তাকে দেওয়া যায় না। তাই ভাল করে সবাইকে পরীক্ষা করছি।

বিপিনবাবু গলা আরও এক পর্দা নামিয়ে বললেন, ধনরত্ব ! কীরকম ধনরত্ন?

ওঃ, সে ভাবতেও পারবে না। খাঁটি আকবরি মোহরই হল সাত ঘড়া। তার ওপর বিস্তর হিরে, মুক্তো। এই দ্যাখো,বলে লোকটি কোটের পকেট থেকে একটি

মোহর আর একটি বেশ ঝলমলে ছোট্ট পাথর বের করে দেখাল। বলল, এই হল নমুনা।

বলেন কী? বিপিন একেবারে হাঁ।

সত্যি কথাই বলছি। টক করে মোহর আর হিরে পকেটে পুরে বলল লোকটা।

তা সেসব কোথায় আছে?

যে ফস করে বলে ফেলব ।

না, না, আপনাকে মোটেই বোকা বলে মনে হয় না।

বোকা নইও, বুঝলে, ধনরত্বের ঠিকানা বলে দিলেই তো আমার মাথায় ডাণ্ডা মেরে গিয়ে সব গাপ করবে।

আজ্ঞে না, কৃপণ হলেও আমি তত পাষণ্ড নই।

কিন্তু লোকে তোমাকে পাষণ্ডই বলে থাকে, তা জানো? যাকগে, তুমি পাষণ্ড হলেও কিছু যায় আসে না। ধনরত্ব যেখানে আছে সেখানে গিয়ে ফস করে হাজির হওয়াও সোজা নয়। সে খুব ভয়ঙ্কর দুর্গম জায়গা। এ শর্মা নিয়ে না গেলে বেঘোরে ঘুরে মরতে হবে।

যে আজ্ঞে। তা এবার একটু সবিস্তারে না বললে যে সবটা বড় ধোঁয়াটে থেকে যাচ্ছে। আপনার শ্রদ্ধেয় নামটিও যে এই পাপী কানে শুনতে পেলুম না এখনও।

বুড়ো খিঁচিয়ে উঠে বলল, থাক-থাক, আর অত বিনয়ের দরকার নেই। আমার নাম রামভজন আদিত্য। রামবাবু বা ভজনবাবু যা খুশি বলতে পারো।

তবু বিপিনবাবু খুব বিনয়ের সঙ্গেই বললেন, আচ্ছা, আপনি কি অন্তযামী? আমি যে সকালে মজা কলা খাই, আমার পিসি যে আমাকে একজোড়া করে জুতো দেয়, বাজারে গিয়ে ফেলা-ছড়া জিনিস কুড়িয়ে আনি, এসব তো আপনার জানার কথা নয়?

ধ্যাত, অন্তর্যামী হতে যাব কোন দুঃখে? আমি নফরগঞ্জে এসে একজনকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এই গাঁয়ে কৃপণ লোক কেউ আছে কি না। অমনই দেখলাম, আরও লোক জুটে গেল। তারা পঞ্চমুখে তোমার সব গুণকীর্তির কথা বলতে লাগল। কেউ-কেউ এমনও বলল যে, তোমার মতো পাষণ্ডের মুখ দেখলেও নাকি পাপ হয়।

বিপিনবাবুর মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছিল। এত বড় সাহস নফরগঞ্জের লোকদের? নামগুলো জেনে নিয়েনাঃ, বিপিনবাবুর মাথাটা আচম্বিতে ফের ঠাণ্ডা হয়ে গেল। লোকগুলো তাঁর নিন্দে করে তো উপকারই করেছে! নইলে কি এই রামবাবু বা ভজনবাবু তাঁর কাছে আসতেন? বিপিনবাবু খুবই বিগলিত মুখ করে বললেন, তারা মোটেই বাড়িয়ে বলেনি। বরং কম করেই বলেছে । তারা তো আর জানে না যে, আশপাশে লোকজন না থাকলে আমি জুতোজোড়া পা থেকে খুলে

হাতে ঝুলিয়ে হাঁটি, অন্যদের মতো মাসে-মাসে চুল না ছেঁটে আমি বছরে দুবার ন্যাড়া হই, দাড়ি কামানোর মেলা খরচ বলে এই দেখুন ইহজন্মে আমি দাড়ি কামাইনি

ভজনবাবুকে খুশি করা কঠিন ব্যাপার। এতসব শোনার পরও তিনি অতিশয় জুলজুলে চোখে বিপিনবাবুর দিকে চেয়ে থেকে বললেন,সবই বুঝলুম, তবে আরও একটু বাড়িয়ে দেখতে হবে বাপু । যাকে-তাকে তো আর অত ধনরত্নের দায়িত্ব দেওয়া যায় না।

বিপিনবাবু হাত কচলাতে-কচলাতে বললেন, আজ্ঞে, আপনার হল জহুরির চোখ। আশা করি আমাকে চিনতে আপনার ভুল হবে না।

ভজনবাবুর ফোকলা মুখে একটু হাসি ফুটল, এখনও ঠিক-ঠিক চিনেছি বলা যায় না। তবে যেন চেনা-চেনা ঠেকছে। এই যে আমি বুড়োমানুষটা এই বাঘা শীতের সন্ধেবেলা কাঁপতে-কাঁপতে এসে হাজির হলুম, তা আমাকে এখন অবধি এক কাপ গরম চা-ও খাওয়াওনি। তুমি পাষণ্ডই বটে।

বিপিনবাবু শিউরে উঠে বললেন, চা! ওরে বাবা, সে যে সাঙঘাতিক জিনিস! আগুন, চা-পাতা, চিনি, দুধ, অনেক বায়নাক্কা।

ভজনবাবু খুব ভালমানুষের মতো মাথা নেড়ে বললেন, তা তো অতি ঠিক কথাই হে বাপু। তবে কিনা সাত রাজার ধনদৌলত পেতে যাচ্ছ, তার জন্য একটু খরচাপাতি না হয় হলই।

তবে কি আমাকে আপনার পছন্দ হয়েছে?

তা তুমিই বা মন্দ কী?

যে আজ্ঞে, তা হলে চায়ের কথাটা মাসিকে বলে আসি

সঙ্গে দুটো বিস্কুট।

বিস্কুট বলে থমকে দাঁড়াল বিপিনবাবু।

ভজনবাবু ফোকলা হেসে বললেন, বিস্কুট শুনে মূর্ছা যাওয়ার কিছু নেই। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট আমি পছন্দ করি।

যে আজ্ঞে, তা হলে আর কথা কী? বিস্কুট তো বিস্কুটই সই।

হ্যাঁ, আর ওইসঙ্গে রাতের খাওয়াটার কথাও বলে এসো। রাতে আমি মাছ-মাংস খাই না। লুচি, আলুর দম, ছোলার ডাল, বেগুনভাজা আর ঘন দুধ হলেই চলবে।

বিপিনবাবু চোখ কপালে তুলে মুর্ছা যাচ্ছিলেন আর কী! নিতান্তই মনের জোরে খাড়া থেকে ভাঙা গলায় বললেন, ঠিক শুনছি তো ! না কি ভুলই শুনলাম।

ঠিকই শুনেছ

ওরে বাবা ! বুকটা যে ধড়ফড় করছে। হার্টফেল হয়ে মরে না যাই।

ভজনবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার হার্টফেল হলে বিদ্যাধরপুরের পাঁচুগোপাল আছে। তাকে আমার সবদিক দিয়েই পছন্দ ছিল। তোমাকে বাজিয়ে দেখে মনে হয়েছিল, তুমি তার চেয়েও সরেস । কিন্তু বুকের পাটা বলতে তোমার কিছু নেই।

বিপিনবাবু সঙ্গে-সঙ্গে বুক চিতিয়ে বললেন, কে বলল নেই! লুচি, আলুরদম, ছোলার ডাল, বেগুনভাজা আর ঘন দুধ তো! ওই সঙ্গে আমি আরও দুটো আইটেম যোগ করে দিচ্ছি, পাতিলেবু আর কাঁচালঙ্কা।

বাঃ বাঃ, এই তো চাই।

আমার হাসিরাশিমাসি রাঁধেও বড় ভাল।

আহা, বেশ, বেশ। আর শোনো, বিছানায় নতুন চাদর পেতে দেবে, একখানা ভাল লেপ। আমি আজেবাজে বিছানায় ঘুমোতে পারি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নফরগঞ্জের উঠতি এবং নবীন চোর চিতেনের এই সবে নামডাক হতে শুরু করেছে। আশপাশের পাঁচ-দশটা গাঁয়ে চোরের মহল্লায় সবাই মোটামুটি স্বীকার করছে যে, চিতেন যথেষ্ট প্রতিভাবান এবং তার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। চিতেন ছিপছিপে, ছোটখাটো, গায়ের রংটি শ্যামলা। চোরেদের বেশি লম্বা হলে বিপদ, তারা চট করে ঝোপেঝাড়ে বা টেবিল বা চৌকির নীচে লুকোতে পারে না। ঢ্যাঙা হলে দূর থেকে চোখেও পড়ে যায়। বেঁটে হওয়াটাও কাজের কথা নয়। বেঁটে হলে অনেক জিনিসের নাগাল পাবে না, উঁচু দেওয়াল টপকাতে সমস্যা হবে এবং লম্বা পা ফেলে দৌড়তে পারবে না বলে ধরা পড়ার সম্ভাবনাও বেশি। চিতেনের উচ্চতা একেবারে আদর্শ। বেঁটে নয়, লম্বাও নয়। রং কালো বলে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিতে সুবিধে। সে দৌড়য় হরিণের মতো। গায়ে জোর-বলও যথেষ্ট। কিন্তু তার আসল প্রতিভা হল চোখে। চিতেনের চোখ সর্বদাই সবকিছুকে লক্ষ করে। সন্দেহজনক কিছু ঘটলেই তার চোখে পড়ে যায়।

রামভজনবাবু যখন সাঁঝবেলাটিতে নফরগঞ্জের হাটখোলার কাছে নবীন মুদির দোকানের সামনে এসে গাঁয়ে কোনও কৃপণ লোক আছে কি না তার খোঁজ করছিলেন, তখনই চিতেন তাঁকে লক্ষ করল। বুড়োমানুষটির হাবেভাবে সন্দেহ করার মতো অনেক কিছু আছে। নবীনের দোকানের সামনে বসে কাঠকয়লার আংড়ায় আগুন পোয়াচ্ছিল গাঁয়ের মাতব্বররা। বিশুবাবু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কৃপণ ! তা মশাই, কৃপণের খোঁজ করছেন কেন?

রামভজন ফোকলামুখে হেনে বললেন,কুঁড়োরহাটের মহাজন বিষ্ণুপদ দাসের নাম শুনেছেন কি? আমি তাঁরই কর্মচারী। তা তাঁর শখ হয়েছে মহল্লার সব কৃপণদের নিয়ে একটা সম্মেলন করবেন। সেরা কঞ্জুষকে কঞ্জুষরত্ন উপাধি দেওয়া হবে। আমার ওপর হুকুম হয়েছে কৃপণ খুঁজে বের করতে। বড়লোকের শখ আর কী !

এ-কথায় সবাই হইহই করে উঠল। ব্যোমকেশবাবু বললেন, তার আর চিন্তা কী? ঠিক জায়গাতেই এসে পড়েছেন। ওই আমাদের বিপনেকে নিয়ে যান, তার মতো কিপ্টে ভূভারতে নেই।

তারপর সবাই মিলে বিপিনবাবুর কিপ্টেমির মেলা গল্প বলে যেতে লাগল। কিন্তু রামভজনবাবুর আষাঢ়ে গল্পটা চিতেনের মোটেই বিশ্বাস হল না। উচ্চবাচ্য না

করে সে ঘাপটি মেরে একধারে বসে রইল। রামভজনবাবু যখন বিপিনের বাড়ি রওনা হলেন তখন সেও পিছু নিল। জানলায় কান পেতে সে সব কথাবাতাও শুনল। ধনরত্বের কথাটা তার মোটেই বিশ্বাস হল না, তবে ব্যাপারটা আসলে কী, সেটা না জেনেই বা চলবে কী করে চিতেনের!

বিপিনের তিন মাসির কারও মনেই যে সুখ নেই তা চিতেন জানে। কাশীবাসীমাসির বয়স এই অষ্টাশি পেরিয়েছে, হাসিরাশিমাসি ছিয়াশি, আর হাসিখুশিমাসির এই আশি হল। তাঁরা কেউ বিয়ে করেননি, তিনজনে মিলে বোনপো বিপিনকে অনেক আশায় মানুষ করেছেন। বিপিন তাঁদের নয়নের মণি। তাঁদের বিষয়সম্পত্তি সবই বিপিনবাবুই পাবেন। এই বাড়িঘর, গয়নাগাটি, নগদ টাকা, সব। কিন্তু হলে কী হয়, বিপিনবাবু বড় হয়ে অ্যায়সা কেপ্পন হয়েছেন যে, মাসিদের ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা। হোমিওপ্যাথির শিশিতে করে রোজ এক শিশি সর্ষের তেল আনেন বিপিন। নিয়ম করে দিয়েছেন, তরকারিতে দশ ফোঁটার বেশি তেল দেওয়া চলবে না। তা সেই অখাদ্য তরকারি মাসিরা গিলবেন কী করে। বিপিন ওই অখাদ্যই সোনা-হেন-মুখ করে খান দেখে তিন মাসিই বিরলে দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন।

একদিন দুপুরবেলা চিতেন নারকোল পেড়ে দিতে এসে দেখল, তিন বুড়ি বোন চোখের জল ফেলতে ফেলতে তেঁতুল দিয়ে কোনওরকমে ভাত গিলছেন। কাণ্ড দেখে চিতেন হাতজোড় করে বলল, মাসিমাগণ, বিপিনবাবু কৃপণ লোক জানি, কিন্তু তা বলে আপনারা কেন কষ্ট করবেন?

হাসিমাসি বললেন, তা কী করব বাবা বল, বিপনে যে দশ ফোঁটার বেশি পনেরো ফোঁটা তেল তরকারিতে দিলে ওরে বাবা, এ যে তেলের সমুদ্র বলে রাগ করে খাওয়া ফেলে উঠে যায়।

চিতেন বলল, মাসিমাগণ, এক-একজনের এক-একরকম সুখ কৃপণের সুখ কৃচ্ছ্বসাধনে। বিপিনবাবু দুঃখ পেতে ভালবাসেন বলেই দুঃখ জোগাড় করে আনেন। তাঁর জন্য আপনাদের দুঃখ হয় জানি, কিন্তু তার ওপর আপনারা যে দুঃখ পাচ্ছেন তাতে দুঃখ যে ডবল হয়ে যাচ্ছে।

তা কী করব বাবা, একটা বুদ্ধি দে।

আমি বলি কী, বিপিনবাবু যখন দুঃখের মধ্যেই সুখ পাচ্ছেন তখন আপনাদের আর দুঃখ বাড়িয়ে কাজ নেই। দিন, টাকা দিন, আমি চুপিচুপি ভাল-মন্দ কিনে এনে রোজ দিয়ে যাব।

সে কি আমাদের গলা দিয়ে নামবে বাবা?

ভাল করে তেল ঘি দিয়ে রান্না করবেন, দেখবেন হড়হড় করে নেমে যাচ্ছে।

তা সেই থেকে চিতেন গোপনে মাসিদের বাজার করে দিয়ে যায় রোজ! সেরা তরকারি, ভাল মাছ, তেল, ঘি। দুধওলাও ঠিক করে দিয়েছে সে। মাসিরা এখন

ভাল-মন্দ খেয়ে বাঁচছেন।

কাজেই এ-বাড়িতে চিতেনের বিলক্ষণ যাতায়াত। ওদিকে বিপিনবাবু ভেতরবাড়িতে এসে শশব্যস্তে হাসিরাশিমাসিকে ডেকে বললেন, ও মাসি, একজন মস্ত বড় মানুষ এসেছেন আজ। তাঁর জন্য লুচি, আলুর দম, ছোলার ডাল, বেগুনভাজা আর ঘন দুধ চাই। তার আগে চা-বিস্কুট। শিগগির থলিটলি দাও, আমি চট করে গিয়ে সব নিয়ে আসি

শুনে তিন মাসিরই মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। হাসিমসি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, কে এসেছে বললি? সাধুটাধু নাকি? শেষে কি হিমালয়-টয়ে নিয়ে যাবে তোকে? ওষুধ করেনি তো!

আহাঃ, সেসব নয়। ইনি মস্ত মানুষ। একে খুশি করতে পারলে মস্ত দাঁও মারা যাবে।

বিপিনবাবু থলিটলি নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে যেতেই খুশিমাসি গিয়ে বিপিনবাবুর ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে উকি মেরে এসে বললেন, হ্যারিকেনের আলোয় যা দেখলুম তাতে মনে হল শুটকো মতো এক বুড়োমানুষ। বাঁদুরে টুপি থাকায় মুখটা ভাল দেখা গেল না। তা সে যেই হোক, তার কল্যাণে বিপিনটার পেটেও যদি আজ একটু ভাল-মন্দ যায়।

উঠোনের দরজা দিয়ে চিতেন ঢুকে পড়ল। বারান্দায় বসা তিন চিন্তিত মাসির দিকে চেয়ে হাতজোড় করে বলল, মাসিমাগণ, আপনাদের বাড়িতে কে একজন মহাজন না মহাপুরুষ এসেছেন বলে শুনলাম ! সত্যি নাকি?

মাসিদের সঙ্গে চিতেনের সম্পর্ক খুবই ভাল। চিতেন যে একজন উদীয়মান নবীন চোর, তাও মাসিদের অজানা নেই। এমনকী কোন বাড়িতে নতুন বউ এসেছে, কোন বাড়িতে কোন নিয়মিত দিয়ে থাকেন। মাসিদের দৃঢ় বিশ্বাস, চিতেনের যা বুদ্ধি আর এলেম তাতে সে একদিন দেশ-দশের একজন হয়ে উঠবে।

কাশীবাসীমাসি বললেন, মহাপুরুষ কি না কে জানে বাবা, তবে বশীকরণ-টরন জানা লোক কেউ এসেছে। ভয়ে আমরা ও-ঘরে যেতে পারছি না।

চিতেন বুক চিতিয়ে বলল, মাসিগণ, ঘাবড়াবেন না, আমি গিয়ে বাজিয়ে দেখে আসছি।

ভজনবাবুর বয়স একশো থেকে দেড়শো বছরের মধ্যেই হবে বলে অনুমান করল চিতেন। দুশো বছর হলেও দোষ নেই। কারণ একটা বয়সের পর মানুষের চেহারা এমন দড়কচা মেরে যায় যে, আর বুড়োটে মারতে পারে না।

তা এই বয়সের মানুষরা সুযোগ পেলেই একটু ঝিমোয় বা ঘুমোয়। কিন্তু ভজনবাবুর ওসব নেই। চিতেন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকেই দেখতে পেল, ভজনবাবু তার দিকে জুলজুল করে চেয়ে আছেন।

তুমি আবার কে হে?

চিতেন হাতজোড় করে বলল,আজ্ঞে, আমাকে এ-বাড়ির কাজের লোক বলে ধরতে পারেন ।

লোকটা চমকে উঠে বললেন, কী সর্বনাশ! কৃপণের বাড়িতে কাজের লোক! কাজের লোকই যদি রাখবে তা হলে আর তাকে কৃপণ বলা যাবে কী করে? অ্যাঁ, এ তো সাঙঘাতিক কথা! তা কত বেতন পাও শুনি!

কাজের লোক নই। বিপিনবাবু নিকষ্যি কৃপণ কৃপণকুলতিলক বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। আমি কাজের লোক হলেও বিনিমাইনে আর আপখোরাকি কাজের লোক। বিপিনবাবুর তিন মাসি আছেন, তাঁরা আমাকে একটু-আধটু স্নেহ করেন আর কী

অ! তা কী মনে করে আগমন?

আজ্ঞে। মাসিরা জানতে পাঠালেন, আপনার কোনও সেবার দরকার আছে কি না।

সেবা ! কীরকম সেবা?

এই ধরুন, একটু গা-হাত-পা টিপে দেওয়া বা মাথায় বিলি কাটা বা আঙুল মটকানো!

ভজনবাবু অাঁতকে উঠে বললেন, ও বাবা, ওসব করলে এই বুড়ো শরীরের হাড়গোড় ভেঙে যাবে।

তা হলে অন্তত জুতো মোজা খুলে দিই, বাঁদুরে টুপিটাও খুলে ফেলে বেশ জুত করে বসুন।

ভজনবাবু আতঙ্কিত গলায় বলে উঠলেন, না, না, এই বেশ আছি।

তা রাত্রিবেলা তো এখানেই দেহরক্ষা করবেন, না কি?

মানে ! মশকরা করছ নাকি হে!

জিভ কেটে হাতজোড় করে চিতেন বলে,আজ্ঞে মুখ্যু সুখ্যু মানুষ কী বলতে কী বলে ফেলি। বলছিলাম, রাতে তো এখানেই ঘাঁটি গাড়তে হবে, না কি!

ভজনবাবু চিড়বিড়িয়ে উঠে বললেন,তুমি তো আচ্ছা বেয়াদব লোক দেখছি হে! এখানে ঘাঁটি গাড়ব না তো কি এই শীতের মধ্যে মাঝরাতে বুড়োটাকে বাইরে বের করে দেবে নাকি?

জিভ কেটে এবং নিজের কান মলে চিতেন ভারী অনুতপ্ত গলায় বলে, কী যে বলেন ভজনবাবু, শুনলেও পাপ হয়। এই বাড়িঘর আপনার নিজের বলেই মনে করুন। বলছিলুম কী, ভজনবাবু, আপনার কি জুতো-মোজা পরেই শোয়ার অভ্যেস?

ভজনবাবু খ্যাক করে উঠে বললেন, কেন, আমি কি পিচেশ না সাহেব যে, জুতো পরে বিছানায় শোব?

একগাল হেসে চিতেন বলল, যাক বাবা, বাঁচা গেল। এমন ঢাকাচাপা দিয়ে রেখেছেন নিজেকে যে, চেনার উপায়টি পর্যন্ত নেই। তা বলছিলুম ভজনবাবু, ওদিকে তো মাসিরা ময়দা-টয়দা মেখে ফেলেছে, ছোলার ডাল সেদ্ধ হয়ে এল বলে, তা এই সময়টায় জুতো-মোজা খুলে একটু হাত-মুখ ধুয়ে নিলে হয় না? টুপিটা খুলতে না চান খুলবেন না, কিন্তু যদি অনুমতি করেন তো পায়ের কাছটিতে বসে জুতোজোড়া খুলে দিই। বেশ জাম্বুবান জুতো আপনার, ফিতের ঘর বোধ হয় দশ-বারোটা।

ভজনবাবু একটু দোনোমোনো করে বললেন, তা খুলতে পারো

মহানন্দে চিতেন ভজনবাবুর পায়ের কাছটিতে বসে জুতো খুলতে লেগে গেল। ভজনবাবুর লম্বা ঝুলের কোটটা হাঁটুর নীচে প্রায় গোড়ালি অবধি নেমেছে। ডান দিকের পকেটটা চিতেনের একেবারে হাতের নাগালে। এই পকেটেই মোহর আর হিরেখানা রয়েছে। ডান পায়ের জুতো খুলতে-খুলতেই দু আঙুলের ফাঁকে ধরা আধখানা ব্লেড দিয়ে পকেটের কাপড়টা ফাঁক করে ফেলল চিতেন। টুকুস করে মোহর আর হিরেখানা তার মুঠোয় এসে যাওয়ার কথা। কিন্তু খুবই আশ্চর্যের বিষয়, পকেট থেকে কিছুই পড়ল না। তবে কি বা পকেট? নাঃ, এতটা ভুল চিতেনের চোখ করবে না। জানলার ফাঁক দিয়ে সে সবই লক্ষ করেছে। তবে যদি হুঁশিয়ার বুড়ো পকেট বদল করে থাকে তো অন্য কথা। চিতেন বা পায়ের জুতো খোলার সময় বা পকেটটাও কেটে ফেলল, কিছুই বেরোল না।

ফোকলা মুখে একটু হেসে ভজনবাবু বললেন, কী, পেলে না তো! ওরে বাবা, তোমার মতো কাঁচা চোর যদি আমাকে বোকা বানাতে পারত, তা হলে আর এই শর্মার নাম রামভজন আদিত্য হত না, বুঝলে? পকেটদুটো খামোখা ফুটো করলে, এখন ফের সেলাই করে কে?

চিতেন একটু বোকা বনে গিয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে ভজনবাবুর পা ছুয়ে একটা প্রণাম করে বলল, আপনি ওস্তাদ লোক।

ভজনবাবু দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললেন, আনাড়িতে যে দেশটা ভরে গেল রে বাপ! যেমন কাঁচা মাথা, তেমনই কাঁচা হাত। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, এইসব দেখতেই কি এতদিন বেছে আছি! এর

চেয়ে যে মরে যাওয়া অনেক ভাল ছিল।

চিতেন লজ্জায় কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থেকে খুব অভিমানের সঙ্গে বলল, তা আমাদের শেখায় কে বলুন ! নফরগঞ্জের মতো পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছি, ভাল কোচ পাব কোথায়? ঠিকমতো কোচিং পেলে কি আর খেল দেখাতে পারতুম

না! তা ভাগ্যে যখন আপনাকে পেয়ে গেছি তখন আর ছাড়ছি না, দু-চারটে কায়দা শিখিয়ে দিন ভজনবাবু।

আমি কি চোর না ছ্যাচড়া? তুমি তো আচ্ছা বেয়াদব হে ! ওসব আমার কর্ম নয়। যারা শেখায় তাদের কাছে যাও।

কচুমাচু হয়ে চিতেন বলল, আপনার বুঝি এসব আসে না?

পাগল নাকি? জীবনে পরদ্রব্য ছুইনি। তবে হ্যা, শিখতেই যদি চাও তবে কুঁড়োহাটের সামন্তকে গিয়ে ধরো। এই অষ্টাশি বছর বয়স হল, তবু বিদ্যে ভোলেনি। ভাল চেলা পেলে শেখায়। পাঁচশো টাকা নজরানা আর সেইসঙ্গে ভালরকম ভেট দিতে ভুলো না। ভেট মানে জ্যান্ত একটা পাটা, আস্ত একখানা রুই মাছ, মিহি পোলাওয়ের চাল, গাওয়া ঘি আর তরিতরকারি এইসব আর কী।

চিতেন লজ্জিতভাবে মাথা চুলকে বলল, তাই যেতাম ভজনবাবু। কিন্তু ভাবছি কুঁড়োরহাটে সামন্তর কাছে গিয়ে এত বিদ্যে শিখে হবেটাই বা কী? আমাদের কাজ তো এই নফরগঞ্জের মতো অজ পাড়াগাঁয়ে। গেরস্তবাড়িতে ঢুকে পাওয়া যায় তো লবডঙ্কা। বড়জোর কাঁসার বাসন, মোটা ধুতি, মোটা শাড়ি, খুব বেশি হলে ফিনফিনে সোনার একটা চেন বা মাকড়িটাকড়ি। পাইলট হয়ে এসে কি শেষে গোরুর গাড়ি চালাব মশাই?

ভজনবাবু ফোকলা মুখে একগাল হেসে বললেন, তা বটে। ভাল চোরেরও আজকাল পেট ভরে না। দেশে খুবই অরাজক অবস্থা।

তা ইয়ে, বলছিলুম কি ভজনবাবু, একটা কথা ছিল।

কী কথা হে?

আমি আড়ি পেতে আপনার আর বিপিনদাদার কথাবার্তা সবই শুনেছি। তা মশাই, আপনি কৃপণ লোক কেন খুঁজছেন সেটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বুঝতে মাথা চাই, বুঝলে? কৃপণ লোক কেন খুঁজছি এটা বুঝতে পারা শক্তটা কী? কৃপণের কাছে কিছু থাকলে সে সেটা বুক দিয়ে আগলে রাখবে, মরে গেলেও খরচ করবে না। তাই কৃপণ হল ব্যাঙ্ক। এক তাল সোনা তাকে দিয়ে তীর্থভ্রমণে চলে যাও। তিন মাস পরে এসে দেখবে এক তাল সোনাই রয়েছে, এক রতিও খরচ হয়নি।

সেটা ঠিকই। তবে কৃপণ নিজের জিনিসই আগলায়, অন্যের গচ্ছিত রাখা জিনিসও কি আগলাবে ভাবেন?

দুর বোকা, অন্যের জিনিস বলে ভাবতে দেবে কেন? তাকে এক তাল সোনা দিয়ে বলো, এটা তোমাকে দিলুম।

তারপর?

তারপর এসে একদিন তাপ্পি মেরে হাতিয়ে নিলেই হল।

চিতেন চোখ বড় বড় করে বলল, আপনি যে সাঙ্ঘাতিক লোক মশাই।

সাঙঘাতিক কি না জানি না, তবে গবেট নই।

তা হলে ভজনবাবু, আপনি সত্যি-সত্যিই ওইসব সোনাদানা আর হিরে-জহরত বিপিনবাবুকে দিচ্ছেন না।

ভজনবাবু ফের ফোকলা মুখে হেসে বললেন,তাই কি বলেছি? ওরে বাবা, আমারও তো বয়স হল, না কি ! এই একশো পেরিয়ে দেড় কুড়ি। তোমাদের হিসেবে একশোত্রিশ বছর। দু-চার বছর এদিক-সেদিক হতে পারে, কিন্তু কবে পটল তুলি তার ঠিক কী? তা আমি পটল তুললে তোমার ওই বিপিনবাবুই সব পাবে।

একটা শ্বাস ফেলে চিতেন বলল, বুঝেছি। বিপিনবাবুকে আপনি জ্যান্ত যখ করে রেখে যেতে চান।

নাঃ, তুমি একেবারে গবেট নও তো ! বুদ্ধি আছে।

তা ভজনবাবু, এই যে আপনি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এখন আপনার ধনসম্পত্তি দেখাশোনা করছে কে?

তার ভাল ব্যবস্থা আছে। গজানন, ফুলমণি, নরহরি সব দিনরাত চোখে চোখে রাখছে।

তারা কারা? আপনার ছেলেমেয়ে বুঝি?

ওরে বাবা, না। তারা সব অশরীরী।

অশরীর মানে! ভূত নাকি?

মানে তো তাই দাঁড়ায়। তবে কিনা সামনেই ফাল্গুন মাস।

ফাল্গুনে নয়নপুরে শিবরাত্রির মেলা। সেখানে ভূতেদেরও মস্ত মেলা হয়। বছরে এই একটাই তাদের বড় পরব। তাই সবাই মাঘ মাসেই সেখানে দলে দলে গিয়ে হাজির হয়। আমার মুখ চেয়েঙ তারা পাহারা দিতে রাজি হয়েছে বটে, কিন্তু দেরি দেখলে সব নয়নপুরে পালাবে। ভূতেদের বিশ্বাস কী বলো!

চিতেন বড়-বড় চোখে চেয়ে বলে, আপনার ভয়ডর নেই নাকি মশাই?

খুব আছে, খুব আছে। প্রথম যখন সেখানে গিয়ে হাজির হই, চারদিকে দুর্দম জঙ্গল, কয়েক ক্রোশের মধ্যে লোকালয় নেই। ভাঙা পোড়ো বাড়ির মধ্যে বিষধর সাপখোপ ঘুরে বেড়ায়,

ওপর গিসগিস করছে ভূত। সে কী তাদের রক্ত-জল-করা হিঃ হিঃ হাসি, কী দুপদীপ শব্দ, কী সব ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

আপনার ভয় করল না ?

করেনি আবার! দাঁতকপাটি লেগে যাই আর কী ! তবে কিনা সোনাদানা, হিরে-জহরতের মায়াও কি কম! তাই মাটি কামড়ে পড়ে ছিলাম। ওই দু-চারদিন

যা ভয়টয় করেছিল। তারপর দেখলাম, ভূতকে ভয় করে লাভ নেই। বরং ভাব জমাতে পারলে লাভ। ভূতেরাও দেখল, আমাকে তাড়ানো সহজ নয়। তাই তারাও মিটমাট করে নিল। এখন বেশ শান্তিপূর্ণ-সহাবস্থান চলছে।

আর সাপখোপ?

তাদেরও আমি ঘটাই না, তারাও আমাকে ঘাঁটায় না। জঙ্গলেরও একটা নিয়ম আছে। তোমাদের মতো অরাজক অবস্থা নয়। যে যার নিজের এলাকায় নিজের কাজটি নিয়ে থাকে, অযথা কেউ কাউকে বিরক্ত করে না।

ঠিক এই সময়ে কাশীবাসীমাসি এক কাপ গরম চা আর পিরিচে দুখানি বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকতেই ভজনবাবু একগাল হেসে বলে উঠলেন, এসো খুকি, এসো। তা নামটি কী তোমার?

কাশীবাসীমাসি ভয়-খাওয়া ফ্যাসফ্যাসে গলায় বললেন, আজ্ঞে, আমি কাশীবাসী। আপনি মহাজন মানুষ, গরিবের বাড়িতে একটু কষ্ট হবে। বিপিন বাজার থেকে এসেই আপনার জন্য ময়দা মাখতে বসেছে। এল বলে!

আহা, তার আসার দরকার কী? মাখুক না ময়দা। ময়দার ধর্ম হল যত মাখা যায় ততই লুচি মোলায়েম হয়। কী বলো হে?

চিতেন মাথা নেড়ে বলল, আজ্ঞে, অতি খাঁটি কথা। তা ভজনবাবু, এই সাঙঘাতিক জায়গাটা ঠিক কোথায় বলুন তো ! কাছেপিঠেই কি? না কি একটু দূরেই?

ভজনবাবু চায়ে বিস্কুট ডুবিয়ে খেতে খেতে একটা আরামের শ্বাস ফেলে বললেন, কাছে না দূরে, পুবে না পশ্চিমে সেসব বলে কি নিজের আখের খোয়াব হে? আমাকে অত আহাম্মক পাওনি।

আজ্ঞে তা তো বটেই। সবাইকে বলে বেড়ালে আর গুপ্তধনের মানমর্যাদা বলেও কিছু থাকে না কিনা। মোহর তা হলে ওই সাত ঘড়া-ই তো ! না কি দু-চার ঘড়া এদিক-সেদিক হতে পারে?

পাক্কা সাত ঘড়া। গত ষাট বছর ধরে রোজ গুনে দেখছি, কম-বেশি হবে কী করে?

আর ইয়ে ভজনবাবু, হিরে-মুক্তে কতটা হবে?

তা ধরো আরও সাত ঘড়া।

আপনি প্রাতঃস্মরণীয় নমস্য মানুষ। একটু পা টিপে দেব কি ভজনবাবু?

খবরদার না।

আচ্ছা, আপনার তো একজন কাজের লোকও দরকার, নয় কি? বয়স হয়েছে, জঙ্গলে একা থাকেন।

একাই দিব্যি আছি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাত নটা নাগাদ নবীন মুদি যখন দোকান বন্ধ করার জন্য তোড়জোড় করছে, তখন দুটো লোক এসে হাজির। দু'জনেরই মুশকো চেহারা। একজন আর-একজনকে বলছিল, তোর জন্যই সুযোগটা ফসকাল। বললুম অতটা পাঠার মাংস খাওয়ার পর একবাটি পায়েস আর গিলে কাজ নেই। শুনলি সেই কথা ! পেট খারাপ করে ফেললি বলেই তো লোকটা হাওয়া হয়ে গেল । এমন সুযোগ আর আসবে?

বলতেন জানো গোপালদা, তিনি বলতেন, ওরে গোবিন্দ, পাত পুছে খাবি, খাবার জিনিস ফেললে অভিশাপ লাগে। আজ যা ফেলবি কাল তারই আর নাগাল পাবি না। ধর বেগুনভাজাটা ফেলে উঠলি, তো একদিন দেখবি তোর পাতে আর কেউ বেগুনভাজা দিচ্ছে না, মাছ ফেলবি তো পাতের মাছ একদিন লাফিয়ে পালাবে। সেই শুনে ইস্তক আমি খুব হুঁশিয়ার হয়ে গেছি। মরিবাচি পাতে কিছু ফেলে উঠি না।

আহা, কী মধুর বাক্যই শোনালেন । বলি, খাওয়াটা আগে না কাজটা আগে? এই তোকে বলে রাখছি গোবিন্দ, ওই লোভই তোকে খাবে। এ পর্যন্ত তোর পেটের রোগের জন্য কটা কাজ পণ্ড হল সে হিসেব আছে?

এবারের মতো মাপ করে দাও দাদা। হেঁটে হেঁটে হেদিয়ে গেছি, খিদেও লেগেছে বড় জোর।

এর পরেও খেতে চাস? তোর কি আক্কেল নেই?

গোপাল অভিমানভরে বলল, আমার খাওয়াটাই দেখলে গোবিন্দদা, আর এই যে সাত ক্রোশ হটলুম এটার হিসেব করলে না? পেটের নাড়িভুড়ি অবধি খিদের চোটে পাক খাচ্ছে।

দুজনে সামনের বেঞ্চে বসে পিরানের নীচে কোমরে বাঁধা গামছা খুলে মুখটুখ মুছল। তারপর গোপাল নবীনের দিকে চেয়ে বলল, ওহে মুদি, শুটকো চেহারার একজন বুড়ো মানুষকে এদিকপানে আসতে দেখেছ?

নবীন লোক দুটোকে বিশেষ পছন্দ করছিল না। সে নির্বিকার মুখে বলল, সারাদিন কত লোক আসছে যাচ্ছে । মোটকা, শুটকো, বুড়ো, যুবো, কালো, ধলো, কে তার হিসেব রাখে । তা বুড়ো মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছেন কেন?

গোবিন্দ আর গোপাল একটু মুখ-তাকাতাকি করে নিল । তারপর গোপাল বলল, ইনি আমাদের দাদু হন। মাথার একটু গণ্ডগোল আছে। রাগ করে বেরিয়ে পড়েছেন, তাই খুঁজতে বেরিয়েছি। ভাল করে ভেবে দ্যাখো দিকি, লম্বা কোট আর বাঁদুরে টুপি পরা খুব শুটকো চেহারার একজন বুড়ো মানুষকে দেখেছ বলে মনে পড়ে কি না।

নবীনের খুব মনে আছে। তবে সে এ দুজনকে একটু খ্যাপানোর জন্য বলল, কত লোক আসছে যাচ্ছে, কত মনে রাখব? তবে একটু ভাবতে হবে। ভাবলে যদি মনে পড়ে !"

তা ভাবতে কতক্ষণ লাগে তোমার?

নবীন বলল, আমাদের বিদ্যেবৃদ্ধি তো বেশি নয়, তার ওপর গেঁয়ো মানুষ, আমাদের ভাবতে একটু বেশি সময় লাগে মশাই । এই ধরুন ঘণ্টাখানেক ।

তো তাই সই। ততক্ষণ আমাদের দুজনকে আধসের করে চিড়ে আর একপো করে আখের গুড় দাও দিকিনি। দইটই পাওয়া যায় না এখানে?

পাওয়া যাবে না কেন? পয়সা দিন, মহাদেব ময়রার দোকান থেকে এনে দিচ্ছি।

বাঃ, তুমি তো বেশ ভাল লোক দেখছি।

নফরগঞ্জ ভাল লোকদেরই জায়গা।

নবীন পয়সা নিয়ে দই এনে দিল, তাতে তার কিছু আয়ও হল। পাঁচশো গ্রামের জায়গায় পঞ্চাশ গ্রাম কম এনেছে সে। এই সূক্ষ্ম হেরফের বোঝার মতো মাথা লোকদুটোর নেই! অবস্থাও বেগতিক। সাত ক্রোশ হেঁটে এসে দু'জনেই হেঁদিয়ে পড়েছে। নবীন একটু চড়া দামেই দুটো মেটে হাড়ি বেচল গোবিন্দ আর গোপালকে। দুজনে হাঁড়িতে চিড়ে মেখে গোগ্রাসে খেয়ে এক এক ঘটি করে জল গলায় ঢেলে ঢেকুর তুলল। তারপর গোবিন্দ জিজ্ঞেস করল,মনে পড়ল নাকি হে মুদিভায়া?

ভাল করে ভেবে দেখছি। সেই প্রাতঃকাল থেকে যত লোক এসেছে গেছে সকলের মুখই ভাবতে হচ্ছে কিনা। এক ঘণ্টার মোটে এই আধ ঘণ্টা হল। তাড়া কীসের?

একটু তাড়াতাড়ি আর কষে ভাবো হে। আধ ঘণ্টা পুরতে আর কতক্ষণই বা লাগবে, বড়জোর পাঁচ সাত মিনিট।

নবীন ফিচিক করে হেসে বলল, তা মশাই, মাথাটা যে খাটাতে হচ্ছে তারও তো একটা মজুরি আছে না কি?

ও বাবা, তুমি যে ধুরন্ধর লোক

যা আকাল পড়েছে। বেঁচেবর্তে থাকতে গেলে ধুরন্ধর না হয়ে উপায় আছে?

তা কত চাও?

পাঁচটা টাকা ফেললে মনে হয় মাথাটা ডবল বেগে কাজ করবে।

রেট বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে হে। দুটো টাকা ঠেকাচ্ছি, ওর মধ্যেই মাথাটা খাটিয়ে দাও ভাই।

নবীন টাকা দুটো গেজের মধ্যে ভরে ফেলে বলল, যেমনটি খুঁজছেন তেমন একজন এই সন্ধেবেলাতেই এসেছিলেন বটে। তিনি একজন কৃপণ লোক খুঁজছিলেন।

এ-কথায় দুজনেই সোজা হয়ে বসল। গোপাল বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তো সেই লোক। তা গেল কোথায় লোকটা?

দুজনে ফের মুখ-তাকাতাকি করে নিল । তারপর গোপাল বলল, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি মুদির পো?

দিনকালটা কী পড়েছে সেটাও বিবেচনা করুন। বিনি পয়সায় কোন কাজটা হচ্ছে?

কথাটা ভাল করে শেষ করার আগেই গোবিন্দ নামের লোকটা চাদরের তলা থেকে ফস করে একটা হাতখানেক লম্বা ঝকঝকে ছোরা বের করে লাফিয়ে উঠে নবীনের গলার মাফলারটা খামচে ধরে বলল,আমার হলুম কত্তাবাবুর পাইক, আমাদের সঙ্গে ইয়ার্কি?

নবীন চোখ কপালে তুলে কাঁপতে-কাঁপতে বলল, বলছি, বলছি। তিনি ওই সাতকড়ি শিকদারের বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন।

উনিই এখানকার সবচেয়ে কৃপণ লোক কিনা। সোজা গিয়ে ডানহাতি গলির শেষ বাড়ি।

গোবিন্দ বিনা বাক্যে নবীনের গেজেটা কেড়ে নিয়ে নিজের ট্যাকে গুজে বলল, শোনো মুদির পো, তুমি অতি পাজি লোক। আর আমরাও খুব ভাল লোক নই। এর পর থেকে সমঝে চোলো।

এই বলে গোবিন্দ হাতের কানা দিয়ে নবীনের মাথায় একখানা ঘা বসাতেই রোগাভোগা নবীন মূর্ছা গেল। গোপাল আর গোবিন্দ মিলেধরাধরি করে নবীনকে দোকানের ভেতরে ঢুকিয়ে তার ট্যাঁক থেকে চাবি নিয়ে দোকান বন্ধ করে বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দিল।

গোপাল খুশি হয়ে বলল, বাঃ, কাজটা বেশ পরিষ্কার করে করেছিস তো !

গোবিন্দ দুঃখের সঙ্গে বলল, লোকে এত আহাম্মক কেন বলো তো ! এই যে মুদির পোকে এক ঘা দিতে হল, এতেই ভারী পাপবোধ হচ্ছে। বোষ্টম হওয়ার পর থেকে আর লোকজনকে মারধর করতে ইচ্ছে যায় না, জানো ! কিন্তু একে না মারলে ঠিক চেঁচিয়ে লোক জড়ো করত।

ঠিক বলেছিস। এখন চল সাতকড়ি শিকদারের খপ্পর থেকে বুড়োটাকে বের করে এনে চ্যাংদোলা করে নিয়ে কত্তাবাবুর পায়ের কাছে ফেলি।

চলো।

তা ইয়ে, গেজের মধ্যে কত আছে দেখলি না?

গেজে দিয়ে তোমার কাজ কী?

ভাগ দিবি না?

কীসের ভাগ? গেজে তো আমার রোজগার।

কাজটা কি ভাল করলি গোবিন্দ? মানছি তোর গায়ের জোর বেশি, খুনখারাপিও অনেক করেছিস। কিন্তু মনে রাখিস, বুদ্ধি পরামর্শের জন্য এই শর্মাকে ছাড়া তোর চলবে না।

ঠিক আছে, পাঁচটা টাকা দেবখন।

মোটে পাঁচ? আর একটু ওঠ।

তা হলে সাত৷

পুরোপুরি দশ-এ রফা করে ফ্যাল।

কেন, দশ টাকা পাওয়ার মতো কোন কাজটা করেছ তুমি শুনি! গা না ঘামিয়েই ফোকটে রোজগার করতে চাও?

গোপাল মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে নেড়ে বলল, কালটা যদিও ঘোর কলি, তবু এত অধর্ম কি ভগবান সইবেন রে? মুদির গেজের মধ্যে না হোক পাঁচ সাতশো টাকা আছে। বখরা চাইলে আধাআধি চাইতে পারতুম।

কোন মুখে? রদ্দা তো মারলুম আমি, তোমার বখরার কথা তা হলে ওঠে কেন?

তুই কি ভাবিস রদ্দাটা আমিই মারতে পারতুম না? সময়মতো মারতুমও, তুই মাঝখান থেকে উঠে ফটাস করে মেরে দিলি। একে কী বলে জানিস? মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া।

তা তুমি গেজেটা পেলে কী করতে? দিতে আমাকে আধাআধি বখরা?

চোখ কপালে তুলে গোপাল বলল, দিতুম না? বলিস কী? এখনও ভগবান আছেন, এখনও চাঁদসুয্যি ওঠে, এখনও ধর্ম বলে একটা জিনিস আছে। সবাই জানে আমি ধর্মভীরু লোক।

তা হলে বলি গোপালদা, চটের হাটে সেবার তামাকের ব্যাপারির গদিতে হামলা করে ক্যাশ হাতিয়েছিলে, মনে আছে? আমাকে দিলে মোটে এগারোটা টাকা। থলিতে কত ছিল তা আমাকে বলেছিলে কখনও? নিত্যপদর মেয়ের সোনার হারখানা ছিড়ে নিয়ে নয়াগঞ্জে বেচেছিলে, আমাকে কত দিয়েছিলে মনে আছে? মাত্র একুশ টাকা। তখন তো আমি একটাও কথা বলিনি! হিসেবও চাইনি।

গোপাল গলাখাকারি দিয়ে বলল, আচ্ছা, ওই সাত টাকাই দিস। কাজিয়া করে লাভ নেই, হাতে গুরুতর কাজ।

তা বটে।

হঠাৎ গোবিন্দ দাঁড়িয়ে পড়ে পিছুপানে চেয়ে বলল, গোপালদা, কেউ আমাদের পিছু নেয়নি তো ! কেমন যেন একটা মনে হচ্ছে!

গোপাল পেছন দিকটা দেখে নিয়ে বলে, কোথায় কে?

গোবিন্দ ফের বলল, একটা বেটকা গন্ধ পাচ্ছ গোপালদা?

বেটকা গন্ধ! কই না তো!

আমি কিন্তু পাচ্ছি। ঘেমো জামা ছেড়ে রাখলে তা থেকে যেমন গন্ধ বেরোয় সেরকম গন্ধ।

এখন কি গন্ধ নিয়ে ধন্দের সময় আছে রে ! কত্তাবাবু বসে আছেন, বুড়োটাকে নিয়ে গিয়ে তার সামনে ফেলতে হবে, তার পর একটু জিরোতে পারব। চল, চল।

উহু এ যেমন-তেমন গন্ধ বলে মনে হচ্ছে না গো গোপালদা। এ যে তেনাদের গন্ধ!

তোর মাথা।

আমার ঠাকুদা ভূত পুষত, তা জানো? তার ঘরে ঢুকলে এ রকম গন্ধ পাওয়া যেত।

কথাটা শুনে তিন হাত পেছনে দাঁড়ানো পীতাম্বর খুশি হল। এতদিন পর এই প্রথম একটা লোক যে তাকে টের পাচ্ছে এটা খুব ভাল খবর | পীতাম্বর যতদিন বেঁচে ছিল ততদিন ছিল তার

বেজায় ভূতের ভয়। দিনেদুপুরে এ-ঘর থেকে ও-ঘর যেতে পারত না একা। তারপর একদিন যখন দেহ ছাড়তে হল, তখন শরীর থেকে বেরিয়ে এসেই দ্যাখে, সামনে ধোঁয়াটে মতো কে একটা দাঁড়িয়ে, তাকে দেখে আঁতকে উঠে ভূত! ভূত বলে চেঁচিয়ে পীতাম্বর মূছ যায় আর কী? সনাতন তার বন্ধু মানুষ, দুবছর আগে পটল তুলেছে। তা সনাতনই এসে তাকে ধরে তুলল, তারপর বলল, আর লোক হাসাসনি। এতদিন পর পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা, কোথায় খুশি হবি, না মুর্ছা যেতে বসলি? ওরে নিজের দিকে একটু চেয়ে দ্যাখ দেখি। পীতাম্বর নিজের দিকে চেয়ে যা দেখল তাতে তার ফের মূর্ছা যাওয়ায় জোগাড়। সেও ভারী ধোঁয়াটে আর আবছা এক বস্তুতে পরিণত হয়েছে। সেই থেকে তার একটা সুবিধে হয়েছে, ভূতের ভয়টা আর একদম নেই।

তবে হ্যাঁ, নিজের ভূতের ভয় গেলেও অন্যকে ভয় দেখানোর একটা দুষ্টবুদ্ধি তার মাথায় চেপেছে। সনাতন অবশ্য বলে, দুর, দুর, ওসব করে লাভ কী? তার

চেয়ে চল সাতগেছের হাটে মেছোবাজারে ঘুরে বেড়াই। আহা, সেখানকার আঁশটে পচা গন্ধে চারদিক ম ম করছে, গেলে আর আসতে ইচ্ছে যায় না। পীতাম্বরের আজকাল ওসব গন্ধ খুবই ভাল লাগে। কিন্তু শুধু অজানা, অচেনা, অখ্যাত এক ভূত হয়ে থাকাটা তার পছন্দ নয়। নিজেকে জাহির না করলে হলটা কী? তাই সে মাঝেমাঝেই ভরসন্ধেবেলা নির্জন জায়গায় কোনও লোককে একা পেলে তার সামনে গিয়ে উদয় হয়, নাকিসুরে কথাও বলে। দুভাগ্য তার, আজ অবধি কেউ তাকে দেখতে পেল না, তার কথাও শুনতে পেল না । এই তো সেদিন বামুনপাড়ার পুরুতমশাই কোথায় যেন কী একটা পুজো সেরে বটতলা দিয়ে বেশি রাতে একা ফিরছিলেন। পীতাম্বর গিয়ে তার সামনে অনেক লম্ফঝম্ফ করল,টিকি ধরে টানল, হাতে চালকলার থলি কেড়ে নিতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই হল না। পন্ডিতমশাই দিব্যি নির্বিকারভাবে চলে গেলেন। সব শুনে সনাতন বলল, দৃশ্যমান ভূত হওয়া খুব শক্ত। অনেক সাধনা করলে তবে একটু-আধটু দেখা দেওয়া যায় বলে শুনেছি। তা অত কসরত করে লাভ কী? এখন ছুটি পেয়ে গেছিস, ঝুটঝামেলা নেই, মজা করে ঘুরে বেড়াবি চল। বাঁকা নদীর ধারে আজ ভুতুড়ে গানের জলসা বসছে, যাবি? ওঃ, সে যা সুন্দর গান! জগঝম্প, শিঙে, কাসর, বড় কত্তাল, আর তার সঙ্গে ব্যাঙের ডাক, গাধার চেঁচনি আর ঘোড়ার চিঁহিঁহিঁ মিশিয়ে একটা ব্যাকগ্রাউণ্ড তৈরি হয় আর সবাই পুরো বেসুরে চেঁচায়। শুনলে মোহিত হয়ে যাবি। হ্যাঁ, পীতাম্বরের সেই জলসার গান খুবই পছন্দ হল। বেঁচে থেকে এ-গান শুনলে তার দাঁতকপাটি লাগত। কিন্তু এখন যেন কান জুড়িয়ে গেল। মনে হল, হ্যাঁ, এই হল আসল গান ।

তা বলে পীতাম্বর চেষ্টা ছাড়ল না। নিজের বাড়িতে গিয়ে একদিন সে নিজের বিধবা বউ আর ছেলেপুলেদের বিস্তর ভয় দেখানোর চেষ্টা করে এল। কিছুই হল না। শুধু অনেক মেহনতে বারান্দার ধারে রাখা একখানা পেতলের ঘটি গড়িয়ে উঠোনে ফেলে দিতে পেরেছিল। তাতে তার বউ কে রে? বলে হাঁক মেরে বেরিয়ে এসে ভারী বিরক্ত হয়ে বলল, নিশ্চয়ই ওই নচ্ছার বেড়ালটা" বলে ঘটিটা তুলে রাখল। একে তো আর ভূত দেখাও বলে না, ভয় খাওয়াও বলে না। এ-ঘটনা শুনে কিন্তু সনাতন অবাক হয়ে বলল, তুই ঘটিটা ফেলতে পেরেছিস। উরেববাস, সে তো কঠিন কাণ্ড। নাঃ, তোর ভেতরে অনেক পার্টস আছে দেখছি। তুই লেগে থাক, নিশ্চয়ই একদিন লোকে তোকে দেখতে পাবে। সেই থেকে লেগেই আছে পীতাম্বর।

বাঁশতলা জায়গাটা ভারী নিরিবিলি, সাধনভজনের পক্ষে খুবই উপযুক্ত। পীতাম্বর এই বাঁশতলাতে বসেই নিজেকে দৃশ্যমান করে তোলার জন্য ইচ্ছাশক্তিকে চাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। তার ফলও এই ফলতে শুরু করেছে।

গোবিন্দ নামে লোকটা, কেউ পিছু নিয়েছে বলে যে সন্দেহ করল আর বেটিক গন্ধ পেল সে তো আর এমনি এমনি নয়। পীতাম্বরের সাধনারই ফল।

এরা দুজন কোথায় কী মতলবে যাচ্ছে তা পীতাম্বর ভালই জানে। ডানহাতি গলির শেষে সাতকড়ি শিকদারের বাড়ি। কিন্তু যাকে খুঁজতে যাচ্ছে সে ও-বাড়িতে যায়নি, পীতাম্বর তাও জানে। নবীন মুদি এদের ভুল ঠিকানা দিয়েছে। সাতকড়ি শিকদার ষণ্ডাগুণ্ডা লোক, দুবেলা মুগুর ভাঁজে। মেজাজও ভয়ঙ্কর। তা ছাড়া তার আরও এক ব্যারাম আছে। তারা তিন বন্ধুতে মিলে রাতের দিকে প্ল্যানচেট করতে বসে। সে-সময়ে তাদের বিরক্ত করলে খুব চটে যায়। ওই প্ল্যানচেটের আসরে অনেক ঘুরঘুর করেছে পীতাম্বর, কিন্তু কারও ভেতরে সেধোতে পারেনি।

লোকগুলো ভুল ঠিকানায় যাচ্ছে বলে পীতাম্বরের একটু দুঃখ হচ্ছিল। আসলে গোবিন্দ নামে লোকটাকে তার বড় ভাল লাগছে। এ-লোকটাই তাকে প্রথম ভূত বলে টের পাচ্ছে তো, সেইজন্যই পীতাম্বর একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে।

লোক দুটো যখন ডানহাতি গলিটার মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে, তখন পীতাম্বর তাদের সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকে বলল, ওহে বাবারা, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। মানে-মানে ফিরে যাও, নইলে বেঘোরে পড়ে যেতে হবে যে, মুদির পো মহা পাজি লোক, তোমাদের ভুল ঠিকানা দিয়েছে।

গোপাল আর গোবিন্দ অবশ্য পীতাম্বরকে ভেদ করেই ঢুকে পড়ল গলিতে। আর ঢুকেই হঠাৎ থমকে দাঁড়াল গোবিন্দ। চাপা গলায় বলল, একটা গলার স্বর শুনলে নাকি গোপালদা?

গোপাল চটে উঠে বলে, কীসের স্বর বললি?

আহা, চটো কেন? কেউ কিছু বলছে বলে মনে হল না তোমার?

তোর কি মাথা খারাপ? জনমনিষ্যিহীন গলি, এখানে কথা কইবে কে? কইলে আমি শুনতে পেতুম না?

কিন্তু আমি যে শুনলাম?

কী শুনলি ?

ভাল বোঝা গেল না। মনে হল কেউ যেন আমাদের গলিতে ঢুকতে বারণ করছে।

পীতাম্বর আনন্দে আত্মহারা হয়ে দুহাত তুলে নাচতে-নাচতে গেয়ে উঠল, সারা-রা-রা-রা, মার দিয়া কেল্লা!

গোবিন্দ পাংশু মুখে বলল, কে গান গাইছে বলো তো গোপালদা?

গান গাইছে? বলিস কী?

খুব আস্তে শোনা যাচ্ছে বটে, কিন্তু গাইছে ঠিক। অনেকটা যেন মশার গুনগুন শব্দের মতো ।

কী গাইছে ?

মার দিয়া কেল্লা না কী যেন!

গোপাল গম্ভীর হয়ে বলল, এ তো মস্তিষ্ক বিকৃতির রাজলক্ষণ দেখছি! শোন গোবিন্দ, কাজটা নামিয়ে দে, তারপর ফিরে গিয়েই তোকে হরিহর কবরেজের কাছে নিয়ে যাব। মাথার তালুটা চৌকো করে কামিয়ে হরিহর কবরেজ যে মধ্যমনারায়ণ তেল দিয়ে পুলটিস চাপিয়ে দেয় তাতে বহু পুরনো পাগলও ভাল হয়ে যেতে দেখেছি।

না গোপালদা, এ মোটেই পাগলামি নয়। কিছু একটা হচ্ছে।

পীতাম্বর সোল্লাসে বলে উঠল, হচ্ছেই তো! খুব হচ্ছে। তা গোবিন্দভায়া তোমার ওপর বড্ড মায়া পড়ে গেছে বলেই বলছি, সেই বুড়ো ভামটিকে এখানে পাবে না। সে গিয়ে বিপিনবাবুর বাড়িতে উঠেছে।

গোবিন্দ আঁতকে উঠে বলল, ওই আবার

আবার কী? নতুন গান নাকি?

না, কী যেন বলছে। ঠিক বুঝতে পারছি না।

একটা কাজ করবি গোবিন্দ? একটু মাটি তুলে দুটো টিপলি বানিয়ে দুই কানে চেপে ঢুকিয়ে দে। তা হলে আর ঝঞ্ঝাট থাকবে না।

পীতাম্বর চেঁচিয়ে উঠল, না, না, খবরদার না।

গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলে, শিশিরে ভেজা ঠাণ্ডা মাটি কানে দিলে আর দেখতে হবে না, কানের কটকটানি শুরু হয়ে যাবে। তার চেয়ে এক কাজ করি গোপালদা।

কী কাজ ?

এসব ভুতুড়ে কাণ্ড না হয়েই যায় না। আমি বরং রামনাম করি। কী বলো?

গোপাল নীরস গলায় বলল, রামনামে কি আজকাল আর কাজ হয় রে? সেকালে হত। তবু করে দ্যাখ।

পীতাম্বর আর্তনাদ করে উঠল, ওরে সর্বনাশ! ও নাম নিসনি! নিসনি! তা হলে যে আমাকে তফাত হতে হবে।

তা হলও তাই। গোবিন্দ কষে রামনাম শুরু করতেই যেন বাতাসের একটা ঝাপটায় পীতাম্বর ছিটকে বিশহাত তফাতে চলে গেল। আর ওদের কাছে এগোতেই পারল না।

মনের দুঃখে পীতাম্বর অগত্যা সাতকড়ি শিকদারের প্ল্যানচেটের ঘরে ঢুকে পড়ল।

দৃশ্যটা বেশ গা-ছমছমে। মাঝখানে একটা কাঠের টেবিলের ওপর একটা করোটি রাখা। তার পাশেই মোমদানিতে একটা মোম জ্বলছে। একধারে বিশাল

ষণ্ডা চেহারার সাতকড়ি বসে আছে, অন্যপাশে তার ভায়রাভাই নবেন্দ্র, আর তিন নম্বর হল বুড়ো হলধর পাণ্ডা। তিনজনেই ধ্যানস্থ। ভীষণ ঠাণ্ডা বলে তিনজনেই যথাসাধ্য চাপাচুপি দিয়ে বসেছে। হলধরের গলা অবধি বাঁদুরে টুপিতে ঢাকা। হলধরের মধ্যেই নাকি রোজ ভূত সেঁধোয়, প্রত্যেকদিনই হলধর নাকি সুরে নানা কথা কয়। কিন্তু পীতাম্বর জানে, ওসব ফক্কিকারি ব্যাপার। হলধর একসময়ে যাত্রা করত, অভিনয়টা ভালই জানে। ভরটর একদম বাজে কথা।

তবে আজকের সাফল্যে উজ্জীবিত পীতাম্বরের ইচ্ছে হল, সত্যি-সত্যিই হলধরের ঘাড়ে ভর করার। অনেকবার চেষ্টা করে পারেনি ঠিকই, কিন্তু আজ তার ইচ্ছাশক্তি বেশ চাগাড় দিয়ে উঠেছে। ইচ্ছাশক্তির বলে পীতাম্বর খুব সরু হয়ে হলধরের নাক দিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ফলে হলধর দুটো হাঁচি দিল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে এল পীতাম্বর। কিন্তু হাল ছাড়লে চলবে না। সে আর নাকের দিকে না গিয়ে কানের ভেতর দিয়ে গুড়ি মেরে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

আর তার পরই হলধর বলতে শুরু করল, শোনো হে, সাতকড়ি, শোনহে নবেন্দ্র, দুটো মুশকোমতো লোক এদিকেই আসছে। তারা এলে তাদের মারধর করতে যেয়ো না। বরং তাদের বলো, তারা যাকে খুঁজতে এসেছে সে বিপিনবাবুর বাড়িতে আছে।

সাতকড়ি গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনার কি ভর হয়েছে হলধরবাবু?

হয়েছে। আমি এখন আর হলধর নই, অন্য লোক।

কে আপনি বলুন?

আমি পীতাম্বর বিশ্বাস।

কোন পীতাম্বর? নয়াপাড়ার পীতাম্বর নাকি?

সে-ই।

তোমার কাছে আমি পঞ্চাশটা টাকা পাই। জমির খাজনা দিতে ধার নিয়েছিলে, মনে আছে?

মরার পর কি কারও ঋণ থাকে সাতকড়ি?

খুব থাকে। তোমার বউকে শোধ দিতে বলো।

সে আমার কথা শুনবে ভেবেছ? যাক গে, যা বললাম মনে রেখো, দুটো লোক আসছে, ডাকাতটাকাত নয়। বিপিনবাবুর বাড়ির রাস্তাটা বলে দিয়ো।

কথাটা শেষ হওয়ার আগেই দরজার কড়া নড়ে উঠল।

সাতকড়ি গিয়ে দরজা খুলতেই দুটো লোক তাকে ধাক্কা মেরে ঘরে ঢুকে পড়ল। হাতে দু'জনেরই দুটো মস্ত ছোরা।

ঘটনার আকস্মিকতায় কী বলতে হবে তা ভুলেই গেল সাতকড়ি। তার ওপর সে ষণ্ডামাক হলেও ছোরাচুরির মোকাবিলা করার সাহস নেই। সে তিন হাত

পিছিয়ে অাঁ-আঁ করতে লাগল।

বুড়ো হলধরের মুখ দিয়ে পীতাম্বর তখন চেঁচিয়ে বলল, আ মোলো যা, এরা ভয়ে সব ভুলে মেরে দিল। বলি ও গোবিন্দ, ও গোপাল, তোমরা যাকে খুঁজতে এসেছ সে এখানে নেই। সে আছে বিপিনবাবুর বাড়িতে।

গোবিন্দ সোল্লাসে বলে উঠল, গোপালদা, এই তো সেই বুড়ো!

তাতে আর সন্দেহ কী ! আমাদের চিনতেও পেরেছে । তোল, তোল, ঘাড়ে ফেলে নিয়ে ছুট দে।

হলধর বিস্তর হাত-পা ছুড়ল এবং চেঁচিয়ে অনেক ভাল-ভাল কথা বলতে লাগল বটে, কিন্তু সুবিধে হল না। ভাঁজ-করা কম্বলের মতো তাকে লহমায় কাঁধের ওপর ফেলে দাঁড়াল গোবিন্দ। আর গোপাল ছোট্ট একখানা লোহার মুগুর বের করে সস্নেহে এক ঘা সাতকড়ির মাথায়, আর নিচু হয়ে টেবিলের তলায় এক ঘা নবেন্দ্রর মাথায় বসিয়ে দিল। দুজনেই চোখ উলটে পড়ে রইল মেঝেয়।

নির্জন রাস্তা দিয়ে একরকম ছুটতে-ছুটতে গাঁয়ের বাইরে এসে হলধরকে নামিয়ে দাঁড় করাল গোবিন্দ। তারপর দম নিতে-নিতে বলল, খুব তো কাঁধে চেপে নিলে কিছুক্ষণ ! এবার হাঁটো তো চাঁদু। চটপট হাঁটো। কর্তাবাবু তোমার গর্দানের জন্য বসে আছেন।

হলধর ওরফে পীতাম্বর খিঁচিয়ে উঠে বলল, খুব কেরদানি দেখালে যা হোক। পই-পই করে বললুম, ওরে সেই অলুফুনে বুড়ো বিপিনের বাড়িতে গ্যাট হয়ে বসে লুচি গিলছে, তা শুনলে সে কথা! আমার কোন দায় পড়েছিল আগ বাড়িয়ে খবর দেওয়ার? একটু মায়া পড়েছিল বটে, কিন্তু টানাহ্যাঁচড়ায় সেটাও গেছে। যাও, এবার গিয়ে কর্তাবাবুর লাথি ঝাঁটা খাও গিয়ে। গতরখানাই যা বানিয়েছ, ঘিলুর জায়গায় তো আরশোলা ঘুরে বেড়াচ্ছে।

গোবিন্দ হলধরকে একখানা মৃদু রদা মেরে বলল, আর মেলা ফটফট করতে হবে না। পা চালিয়ে চলো তো বাছাধন !

পীতাম্বর ভারী হতাশ হয়ে হলধরের কান দিয়ে বেরিয়ে এল।

খামোখা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আজ আবার নিশুত রাতে মথুরাপুরে শিবু দাসের গুদামে শুটকি মাছ শুকতে নেমন্তন্ন করে গেছে সনাতন।

পীতাম্বর বেরিয়ে আসতেই হলধর চেতনা ফিরে পেয়ে চারদিকে তাকিয়ে হঠাৎ হাঁউ রে মাউ রে করে উঠল, ওরে বাবা রে ! এ আমি কোথায় এলুম রে। কারা ধরে আনল রে; ভূত নাকি রে তোরা ! ভূত ! পায়ে ধরি বাবা ভূত, সাত জন্মেও আর প্ল্যানচেট করব না...

পীতাম্বর খুবই ক্ষুব্ধ চিত্তে দৃশ্যটা দেখছিল। হলধর চেঁচাচ্ছে আর দুই গুণ্ডা তার দু হাত ধরে টানাটানি করছে।

হঠাৎ গোপাল বলল, দাঁড়া তো গোবিন্দ! আমার কেমন যেন একটা সন্দেহ হচ্ছে।

কীসের সন্দেহ?

ওর টুপিটা খোল, মুখখানা ভাল করে দেখি।

কেন বলো তো?

এ সেই লোক না-ও হতে পারে। ভজনবুড়ো এত দুবলা নয়। মনে আছে, গতকাল রাতে কেমন আমাদের হাত ফসকে পিছলে বেরিয়ে গেল !

তা বটে। তা হলে দ্যাখো। বলে গোবিন্দ একটানে বাঁদুরে টুপিটা খুলে ফেলল। গোপাল একখানা দেশলাইকাঠি ফস করে মুখের সামনে ধরতেই হলধর কাঁপতে-কাঁপতে বলল, না বাবা, আমি সে-লোক নই। জন্মেও আমি সে-লোক ছিলাম না। সে-লোকগুলো যতটা খারাপ হয়, আমি ততটা নই বাবারা।

ভাল করে দেখে গোপাল একটা শ্বাস ছেড়ে বলল, না রে, এ সে লোক নয়। ভজনবুড়োর বয়স একশো তিরিশ বছর, আর এ তো আশি বছরের খোকা।

গোবিন্দ বলল, তা হলে তো সাত হাত জল গো গোপালদা! এখন সে-লোককে পাই কোথা?

হলধর হঠাৎ শুনতে পেল, কে যেন বলে দিচ্ছে, বিপিনবাবুর বাড়ি, বিপিনবাবুর বাড়ি

হলধর কাঁপতে-কাঁপতে বলল, বিপিনবাবুর বাড়িতে যাও বাবা, বিপিনবাবুর বাড়িতে মেলা সে-লোক । সে-লোকে একেবারে গিজগিজ করছে।

গোবিন্দ বলল, তখন থেকে কেবল শুনছি বিপিনবাবুর বাড়ি, বিপিনবাবুর বাড়ি। চলো তো চাঁদু, বাড়িটা একবার দেখিয়ে দাও তো !

হলধর বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, তা আর বলতে! আস্তাজ্ঞে হোক, আস্তাজ্ঞে হোক। এই যে এ-দিকে।

পীতাম্বর হাঁফ ছেড়ে বলল, যাক বাবা, আর একটু হলেই শুঁটকি মাছের গন্ধ শোকার নেমন্তন্নটা ভেস্তেই যাচ্ছিল।

হলধর সোজা তাদের নিয়ে গিয়ে বিপিনবাবুর বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কাঁপা গলায় বলল, এই বাড়ি।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হাসিরাশি মাসির মুখে হাসি নেই, বরং রাশি-রাশি দুঃখ।

হাসিখুশি মাসির খুশি উবে গিয়ে ফাঁসির আসামির মতো মুখের চেহারা। কাশীবাসী মাসির কাশী রওনা হওয়ার মতোই অবস্থা। তিন মাসি ভেতরবাড়িতে বারান্দায় গোল হয়ে বসে ডাক ছেড়ে কাঁদতে লেগেছেন। কান্নার শব্দে পাড়াপ্রতিবেশীরাও জড়ো হয়েছে। মাসিদের মাঝখানে সোজা হয়ে বসে চিতেন সবাইকে সান্তনা দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কাশীবাসী মাসি কাঁদতে-কাঁদতে বলছিলেন,বুড়োটাকে দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম, এ ছেলেধরা না হয়েই যায় না।

ছেলেমানুষ বিপিনকে ধরে নিয়ে গিয়ে কাশীর গলিতে গলিতে ভিক্ষে করাবে।

হাসিরাশি মাসি বললেন, সে তো তবু ভাল। কাশীতে ভিক্ষে করলে পুণ্য হয়। লোকটার চোখ দ্যাখোনি! যেন ভাটার মতো ঘুরছে। বলে রাখছি, মিলিয়ে নিয়ো, এ-লোক হল ছদ্মবেশী কাপালিক। নরবলি দেওয়ার জন্য কচি বাচ্চা খুঁজতে বেরিয়েছে। তাই বিপিনকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে।

হাসিখুশি মাসি বলে উঠলেন, বালাই ষাট। ও-কথা কি বলতে আছে? তবে বলেই যখন ফেললে ছোড়দি, তখন আমিও বলি, নরবলি দিয়েই কি ক্ষান্ত থাকবে ভেবেছ? তারপর বিপিনের আত্মাটাকে ভূত বানিয়ে দিন-রাত বেগার খাটাবে।

প্রতিবেশী নরহরিবাবু বললেন, তা অত ভাববার কী আছে? দিন না লোকটাকে আমাদের হাতে ছেড়ে। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকিয়ে দিই।

কাশীবাসী মাসি আর্তনাদ করে উঠলেন, ও বাবা। তার কি জো আছে? লোকটা যে বিপিনকে বশ করে ফেলেছে গো! দ্যাখোগে যাও, গুচ্ছের লুচি গিলে সে-লোক ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে, আর বিপিন তার পা টিপে দিচ্ছে। বলেই দিয়েছে, ভজনবাবুর যদি কোনও ক্ষতি হয়, তা হলে সে আত্মহত্যা করবে।

এইবার একটু ফাঁক পেয়ে চিতেন বলে উঠল, আহা, সব জিনিসেরই যেমন খারাপ দিক আছে, তেমনই একটা ভাল দিকও আছে।

হাসিরাশি মাসি ধমকে উঠলেন, ভাল দিক আবার কী রে হতভাগা? এর মধ্যে কোন ভালটা তুই দেখলি?

চিতেন হেসে বলল, আছে গো মাসি, আছে। সেটা ভেঙে বলা যাবে না। তবে লেগে গেলে সাংঘাতিক ব্যাপার হবে। বিপিনদাদা এক লম্ফে একেবারে মগডালে উঠে যাবেন।

হাসিখুশি মাসি বললেন, কেন, বিপিন কি হনুমান?

চিতেন খুশি হয়ে বলল, জববর কথাটা বলেছেন বটে মাসি। হনুমানই বটে! আমার অনুমান, এবার বিপিনদাদা হনুমানের মতো এক লাফে দুঃখের সমুদুর ডিঙিয়ে একেবারে সুখের স্বর্ণলঙ্কায় গিয়ে পড়বেন।

ওদিকে বাইরে দাঁড়িয়ে ভেতরবাড়ির শোরগোল আর মড়াকান্না শুনে গোবিন্দ আর গোপাল একটু থতমত খেল।

গোপাল বলে, কান্না কীসের? কেউ মরেছে নাকি?

গোবিন্দ বলল, তাই তো মনে হচ্ছে। হলধরকে তারা ছাড়েনি। হলধর চিঁ চিঁ করে বলল, ওরে বাবা, আমি মরা-টরা যে একদম পছন্দ করি না । এই বার আমাকে ছেড়ে দাও বাবাসকল।

গোবিন্দ একটু শঙ্কিত গলায় বলল, ভজনবুড়োটাই মরেনি তো গোপালদা ! তা হলেই তো চিত্তির। একান্নটা টাকা জলে গেল !

আমারও একান্ন টাকা। রেটটা কত্তাবাবু কম দিচ্ছিলেন বলে বেশ রাগ হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে, রেটটা কম হওয়াতে ক্ষতিটাও কমই হল।

গোবিন্দ বলল, সেটা আবার কীরকম হিসেব গো গোপালদা?

বুঝলি না?

বুঝিয়ে দিলে তো বুঝব!

ধর, ভজনবুড়োকে পাকড়াও করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কত্তাবাবু যদি পাঁচশো টাকা করে বখশিশ কবুল করতেন, তা হলে আজ ওই পাঁচশো টাকা করেই জলে যেত। তবে দেখতে হবে ভজনবুড়ো সত্যিই মরেছে কি না।

গোবিন্দ হতাশ গলায় বলল, সে ছাড়া আর কে মরবে ?

গোপাল বলল, মানলুম। কিন্তু ভজনবুড়ো মরলে এরা কাঁদবে কেন বলতে পারিস? ভজনবুড়ো মরলে এদের কী? সে এদের কে? পরস্য পর বই তো নয়।

আহা পর মরলে কি লোকে কাঁদে না? সবাই তো আর আমাদের মতো পাষণ্ড নয়। তা এ লোকটার কী ব্যবস্থা করবে?

একটা রদ্দা মেরে ঝোপে ঢুকিয়ে দে।

হলধর এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই গোবিন্দ তার মাথায় একখানা রদ্দা বসিয়ে অজ্ঞান করে একটা ঝোপের পেছনে টেনে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিল। হাত ঝাড়তে-ঝাড়তে বলল, বোষ্টম হয়ে আর কত পাপ যে করব?

গোপাল কানখাড়া করে কান্নার শব্দ শুনে বলল, এ যা কান্না শুনছি, তাতে একজন মরেছে বলে মনে হয় না। দু-তিনজন মরেছে বলে মনে হচ্ছে। মেলা লোকের গলাও শুনতে পাচ্ছি। গোবিন্দ উৎকণ্ঠিত হয়ে বলল, তা হলে কী হবে গোপালদা?

লোকজন যখন জড়ো হয়েছে তখন সুবিধের কথাই। চল, পেছন দিক দিয়ে গিয়ে ভেতরবাড়িতে ঢুকে ভিড়ে মিশে গিয়ে ব্যাপারটা বুঝি।

তো তাই হল। দুজনে গুটি-গুটি বাড়ির পেছন দিক দিয়ে উঠোনে জড়ো হয়েছে। বারান্দায় একখানা হারিকেন জ্বলছে, তার একটুখানি মাত্র আলো। তাতে উঠোনের কারওই মুখ বুঝবার উপায় নেই। দুজনে মুড়িসুড়ি দিয়ে একটু পেছনে চেপে দাঁড়িয়ে গেল।

গোবিন্দ একটু চাপাগলায় বলল, তিন-তিনটে যক্ষিবুড়ি কেমন সুর করে কাঁদছে দেখেছ, ঠিক যেন কালোয়াতি গান।

সামনে একটা বেঁটেমতো লোক দাঁড়ানো। সে মুখটা ফিরিয়ে বলল, আহা, কাঁদবে না? তিন বুড়ির অন্ধের নাড়ি বোনপোটাকে যে ছেলেধরা এসে নিয়ে যাচ্ছে!

গোবিন্দ চোখ বড় করে বলল, নিয়ে গেছে?

এখনও নেয়নি, তবে নেবে। ছেলেধরাটা ঘরের মধ্যেই আছে।

বলো কী! তা ছেলেধরাটাকে ধরে

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, উহু, উহু, সে উপায় নেই। ছেলেধরার পেল্লায় চেহারা। চার হাত লম্বা, আশি ইঞ্চি বুকের ছাতি, মুগুরের মতো হাত, পেল্লায় গোঁফ আর রক্তবর্ণ চোখ সব সময়ে ভাটার মতো ঘুরছে। হাতে একখানা তলোয়ারও আছে বলে শুনেছি।

বলেন কী!

পাশ থেকে একজন রোগাভোগা লোক বলল, তলোয়ার নয়, তার হাতে রাম-দা। আর চার হাত কি বলছ, সে পাঁচ হাতের সিকি ইঞ্চি কম নয়। সন্ধের দিকে একটা গর্জন ছেড়েছিল তাতে আমার নারকোল গাছ থেকে দুটো নারকোল খসে পড়েছে।

মাফলারে মুখ-ঢাকা একটা লোক চাপাগলায় বলল, ফুঃ, তোমরা তাকে মানুষ ঠাওরালে নাকি? সে মোটেই মানুষ নয়, নির্যস অপদেবতা। আর সন্ধের মুখে তো আমার খুড়তুতো ভাই নন্দর সঙ্গে রথতলার মোড়ে তার দেখা। নন্দ ডাকাবুকো লোক, অত বড় চেহারার মানুষ দেখে ডাকাত বলে ধরতে গিয়েছিল। ধরলও জাপটে । লোকটা স্রেফ হাওয়া হয়ে গেল। দশ হাত পেছন থেকে ডাক দিয়ে বলল, কী রে, ধরবি? আয় ধর দেখি। তা ভয় পেয়ে নন্দ চোঁ-চা দৌড়।

গোপাল নিরীহ গলায় বলল, তা এখন ছেলেধরাটা ঘরের মধ্যে কী করছে?

বেঁটে লোকটা বলল,কী আর করবে! বিপিনকে বস্তায় পুরে বাঁধাছাঁদা করছে বোধ হয়।

লম্বা একটা লোক বলল, আরে না, না, সে বৃত্তান্তই নয়। বিপিনকে কখন বশীকরণ করে ফেলেছে। সে এখন লোকটার পা টিপছে।

গোপাল বলল, তা আমরা একটু লোকটাকে দেখতে পাই না?

দেখে হবেটা কী? ও না দেখাই ভাল।

গোপাল আর গোবিন্দ একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিল। গোবিন্দ বলল, কিন্তু তা হলে শুটকো বুড়োটা কোথায় গেল বলে তো গোপালদা ! যা বিবরণ শুনছি তাতে তো সে এই লোক বলে মনে হচ্ছে না !

গোপাল ততোধিক গলা চেপে বলল, তুই বড় আহাম্মক। এতদিন এ-লাইনে আছিস। আর এটা জানিস না যে, গাঁয়ের লোকেরা সবসময়ে তিলকে তাল করে! নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস কী?

তা বটে ! কিন্তু তেনাকে চাক্ষুষ করারই বা উপায় কী বলো।

একটা কথা আছে, সবুরে মেওয়া ফলে। দামি কথা। মনে রাখিস।

ওদিকে তিন মাসির মাঝখানে বসেও চিতেনের চোখ ঠিকই কাজ করে যাচ্ছিল। সে একজন প্রতিভাবান মানুষ, কাজেই তার চোখ আর পাঁচজনের মতো ম্যাস্তামারা চোখ নয়। সব সময়ে চারদিককার সবকিছুকে দেখছে, বিচার-বিশ্লেষণ করছে এবং কাজেও লাগাচ্ছে। চিতেন আবছা আলোতেও দুজন অচেনা লোককে ভিড়ের পেছন দিকটায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। পাজি লোকদের সে লহমায় চিনতে পারে। এ-দুজন যে পাকা পাজি, তা বুঝে নিতে তার এক মুহুর্তও সময় লাগল না।

চিতেন টপ করে উঠে পড়ল। ধীরেসুস্থে হাসি-হাসি মুখ করে এগিয়ে গিয়ে নিচুগলায় জিজ্ঞেস করল, এ-গাঁয়ে নতুন বুঝি?

লোক দুটো একটু অস্বস্তিতে পড়ে দুজনে একসঙ্গেই বলে, হ্যাঁ।

তা আপনারা কারা?

একজন বলল, আমি গোপাল, আর ও গোবিন্দ।

বাঃ, বেশ, বেশ। তা কাজটা কী?

গোপাল একটু আমতা-আমতা করে বলল, একজন লোককে খুঁজতে আসা। সে বিশেষ ভাল লোক নয়। শুনলুম সে বিপিনবাবুর বাড়িতে থানা গেড়েছে।

কেমন লোক বলুন তো!

শুটকো চেহারার বুড়োমানুষ। বয়স ধরুন হেসেখেলে দেড়শো বছর।

চিতেন খুব ভাবিত হয়ে বলল, দেড়শো বছর। নাঃ মশাই, একটু কমসম হলেও না হয় ভেবে দেখা যেত। এত বয়সের লোক কোথায় পাব বলুন তো ! সাপ্লাই নেই যে!

গোপাল একটু থতমত খেয়ে বলে, তা কিছু কমও হতে পারে।

চিতেন একটু হেসে বলল, তাই বলুন ! তা ধরুন একশো বিশ ত্রিশ বছর হলে চলবে?

খুব চলবে।

শুটকো চেহারা বললেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ । খুব শুটকো।

চিতেন একগাল হেসে বলল, পেয়ে যাবেন।

গোপাল উজ্জ্বল হয়ে বলল, পাব মশাই? কোথায় পাব?

অত ভেঙে তো বলা যাবে না। তবে আমার হাতে একজন একশো ত্রিশ বছরের শুটকো চেহারার লোক আছে। কুড়িটা টাকা পেলে তাকে দেখিয়ে দিতে পারি। পছন্দ হলে আরও কিছু লাগবে।

পটল বিরস মুখে বলে, শুধু দেখতেই কুড়ি টাকা? দরটা বেশি হয়ে যাচ্ছে না মশাই? তার ওপর যদি আসল লোক না হয়

আসল কি না জানি না মশাই, তবে তাঁর নাম রামভজন, তিনি একজন কৃপণ লোক খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

গোপাল চাপা গলায় গোবিন্দর কানে-কানে বলল, গেজেটা থেকে টাকাটা দিয়ে দে। পরে উসুল করে নিলেই হবে।

গোবিন্দ বিরস মুখে তাই করল। চিতেন টাকাটা ট্যাঁকে গুজে বলল, উঠোনের ওই দিকটায় ওই যে চালাঘর দেখছেন ওখানে খড় গাদি করা আছে। ওর মধ্যে সেঁধিয়ে বসে থাকুন। একটু ঘুমিয়েও নিতে পারেন। প্রাতঃকাল অবধি অপেক্ষা করতে হবে। যখন তিনি প্রাতঃকৃত্য করতে বেরোবেন তখন তাঁকে দু চোখ ভরে দেখে নেবেন।

সে কী মশাই! আমাদের যে আজ রাতেই তাকে নিয়ে কত্তাবাবুর কাছে হাজির হওয়ার কথা!

পাগল নাকি? এই যে গাঁয়ের লোকেরা জড়ো হয়েছে দেখছেন, এরা সব সারারাত পাহারা দেবে। একজন ছেলেধরা এসে গাঁয়ের একটা লোককে ধরে নিয়ে যাবে, এমন মজা ছাড়ে কেউ? তা কত্তাবাবুটি কে?

আছেন একজন।

তা কত্তাবাবুর সঙ্গে বন্দোবস্তটা কীরকম হল?

গোবিন্দ ক্ষোভের সঙ্গে বলে বসল, সে আর বলবেন না মশাই, মোটে একান্ন টাকা করে। এই যে এত হয়রানি হুজুত করতে হচ্ছে একান্ন টাকায় পোষায়, বলুন তো ন্যায্য কথা !

চিতেন খুব অবাক হয়ে বলে, একান্ন টাকা ! মোটে একান্ন টাকায় এত বড় কাজ ! এর যে হেসেখেলে বাজারদর দু থেকে পাঁচ হাজার টাকা। এঃ হেঃ হেঃ, আপনাদের যে বড্ড ঠকানো হচ্ছে দেখছি!

গোপাল গোবিন্দকে কনুইয়ের একটা গুতো দিয়ে চুপ করিয়ে রেখে নিজে বলল, তা মশাই, ভোরের আগে কিছু করা যায় না? কত্তাবাবু যে বসে আছেন। বড্ড মেজাজি মানুষ। রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না কি না।

চিতেন নাক সিঁটকে বলল,অমন লোকের কাজ করা মানে ছুঁচে মেরে হাত গন্ধ। আপনারা বরং গিয়ে কত্তাবাবুর কাজে ইস্তফা দিয়ে সন্নিসি হয়ে হিমালয়ে চলে যান।

গোবিন্দ দুঃখের সঙ্গে বলল, আমিও সেই কথাই গোপালদাকে বলি। রেটটা কম হয়ে যাচ্ছে বড়।

চিতেন বলেন, খুবই কম। রামভজনবাবুর বাজারদর এখন আকাশছোঁয়া হবে না-ই বা কেন? সাত ঘড়া মোহর আর সাত কলসি হিরেমুক্তোর মালিক বলে কথা, তাঁর মতো লোককে ধরবেন মাত্র একান্ন টাকা মজুরিতে? আপনাদের কত্তাবাবু যে দেখছি বিপিনবাবুর চেয়েও কঞ্জুষ।

গোপাল আর গোবিন্দর চোখ হঠাৎ গোল হয়ে ভেতরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হল। কিছুক্ষণ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে থেকে গোপাল ফিসফিস করে বলল, কী বললেন ভাই? ঠিক শুনেছি তো?

ঠিক শুনেছেন

সাত ঘড়া কী যেন!"

আর সাত কলসি কী যেন?

হিরে আর মুক্তো। অ্যাই বড়-বড় কাশীর পেয়ারার সাইজের হিরে আর সবেদার সাইজের বড়-বড় মুক্তো । এখনও ভেবে দেখুন কত্তাবাবুর কাজ করবেন কি না।

গোপাল বলল, দুর, দুর। আমি এই এখনই এই মুহূর্তেই এখানে দাঁড়িয়ে কত্তাবাবুর কাজে ইস্তফা দিলুম। তুইও দিবি নাকি গোবিন্দ?

এই যে দিলুম।

চিতেন খুশি হয়ে বলল, বাঃ, বাঃ, চমৎকার। তা এই কত্তাবাবুটি কে?

বিদ্যাধরপুরের পাঁচুগোপাল। অতি বজ্জাত লোক।

চিতেন বলল, অ, তাই বলুন। রামভজনবাবু তাকেই প্রথমে পছন্দ করেছিলেন বটে। কিন্তু বিপিনবাবুকে দেখে তাঁর মত পালটেছে। এখন সব বিষয়সম্পত্তি বিপিনবাবুকেই দিয়ে যাবেন ঠিক করে ফেলেছেন।

গোপাল ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, তা রামভজনবাবু এখন কোথায়?

তিনি এখন লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছেন, আর বিপিনদাদা তাঁর পা টিপছেন।

গোপাল শশব্যস্তে বলল, তা আমরা একটু তাঁর পদসেবা করার সুযোগ পাই না? দিন না একটু ব্যবস্থা করে। না হয় আরও কুড়িটা টাকা দিচ্ছি।

চিতেন বলে, খবরদার, ও-কাজ করবে না। ভজনবাবুর পা এখন বিপিনবাবুর দখলে। প্রাণ গেলেও ওই পা তিনি কারও হাতে ছাড়বেন না।

গোপাল অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, তা বললে কি হয় কখনও? ভজনবাবুর পায়ের ওপর কি আমাদেরও দাবি নেই? একজন দখল করে বসে থাকলেই হবে?

গোবিন্দ বলল, ঠিক কথা। ভজনবাবুর সেবা করার অধিকার সকলেরই আছে।

চিতেন একটু হেসে বলল, সেবার কথা আর বলবেন না মশাই। সেবা নিতে নিতে ভজনবাবুর এখন অরুচি। বললে বিশ্বাস করবেন না, তিনি তো সোনাদানা আগলে গহিন জঙ্গলের মধ্যে বাস করেন। জনমনিষ্যি নেই। তা সেখানেও কী হয় জানেন? দু বেলা দুটো কেঁদো বাঘ এসে রোজ তাঁর পিঠ চুলকে দেয়। ঘুমনোর সময় দুটো গোখরো সাপ এসে তাঁর দু কানে লেজ ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম পাড়ায়। এই শীতকালে রাতের দিকে যখন হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা পড়ে তখন হলধর আর জলধর নামে দুটো ভালুক এসে দুধার দিয়ে ভজনবাবুকে জড়িয়ে ধরে ওম দেয়। গদাধর নামে একটা কেঁদো হনুমান রোজ তাঁর জন্য গাছ থেকে ফলটল পেড়ে আনে। কামধেনু নামের একটা গোরু এসে দুবেলা দু ঘটি করে দুধ দিয়ে যায়..

গোপাল আর গোবিন্দর চোখ ক্রমে ছানাবড়া হচ্ছিল । গোপাল বলল, বলেন কী মশাই!

চিতেন একটু ফিচকে হেসে বলে, ঠিকই বলছি। যাঁর অত সোনাদানা আছে তাঁকে কে না খ্যাতির করে বলুন। তবে ভজনবাবুর তো দিন ফুরিয়ে এল। শুনছি তিনি বিপিনবাবুকে সব দিয়েথুয়ে সন্নিসি হয়ে হিমালয়ে চলে যাবেন।

গোপাল শশব্যস্তে বলল, আচ্ছা না-হয় ভজনবাবুর পা না-ই টিপলুম, বিপিনবাবুর পদসেবা করারও কি সুযোগ হবে না মশাই?

চিতেন দুঃখের সঙ্গে বলে, বিপিনদাদার তো দুটো বই ঠ্যাং নেই। তা সে দুটোর জন্যও মেলা উমেদার। আমার খাতায় ইতিমধ্যেই বিশ-পঁচিশজনের নাম উঠে গেছে। মাথাপিছু কুড়ি টাকা রেট।

গোপাল গোবিন্দকে ধমকে উঠে বলল, হাঁ করে দেখছিস কী? দে টাকাটা গেজে থেকে বের করে।

গোবিন্দর হাত থেকে টাকাটা নিয়ে ট্যাঁকে গুজে চিতেন বলল,বিপিনদাদা আমাকে তাঁর ম্যানেজার করে যে কী ঝঞ্জাটেই ফেলেছেন।

গোপাল চোখ কপালে তুলে বলল, আপনিই তাঁর ম্যানেজার? প্রাতঃপেন্নাম হই।

গোবিন্দ হাতজোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলল, কী সৌভাগ্য ! এ যেন অমাবস্যায় চাঁদের উদয়। কী বলো গোপালদা?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নিজের ঢেকুরের শব্দে চমকে জেগে উঠে বিপিনবাবু বলে উঠলেন, কে রে? পরমুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে এক-একাই লজ্জা পেলেন। ঢেকুরের আর দোষ কী? কাল রাতে রামভজনবাবুর পাল্লায় পড়ে কয়েকখানা লুচি খেয়েছেন। কৃপণের পেটে গিয়ে লুচি যেন আজব দেশে এসেছে, এমন হাবভাব শুরু করে দিয়েছিল তখনই । প্রকাণ্ড ঢেকুরটা যেন লুচির বিদ্রুপ।

বিপিনবাবু উঠে বসে বিছানা হাতড়ে রামভজনের পা দুখানা অন্ধকারে খুঁজতে লাগলেন। পা টিপতে-টিপতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, সেজন্য লজ্জা হচ্ছিল। উনি কিছু মনে করলেন না তো? কিন্তু পা দুখানা বিছানার কোথাও খুঁজে পেলেন না বিপিনবাবু। আশ্চর্য রামভজনবাবুর দু-দুখানা পা যাবে কোথায়? তেলের অপচয় হয় এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে বলে বিপিনবাবু ঘরে আলো জেলে রাখেন না, তাঁর টর্চবাতিও নেই। ফলে অন্ধকারে হাতড়াতে-হাতড়াতে তিনি রামভজনবাবুর হাত, কোমর, পেট, বুক, এমনকী মাথা অবধি খুঁজে দেখলেন। এবং অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, রামভজনবাবুর পা দুখানার মতোই হাত দুখানাও গায়েব হয়েছে। এমনকী, পেট, বুক এবং মাথা অবধি লোপাট। এত জিনিস একসঙ্গে কী করে উধাও হতে পারে , তা তিনি ভেবে পেলেন না। তিনি খুব করুণ মিনতির সুরে বললেন, রামভজনবাবু! রামভজনবাবু! আপনি কোথায়?

কেউ জবাব দিল না । বিপিনবাবু বিছানা ছেড়ে নেমে এসে অন্ধকারেই চারদিক খুঁজতে লাগলেন। চেয়ার, টেবিল এবং খাটের বাজুতে বারকয়েক ধাক্কা খাওয়ার পর হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, সদর দরজাটা যেন সামান্য ফাঁক হয়ে আছে!

কাছে গিয়ে দেখলেন, সত্যিই খিল খোলা। তবে কি রামভজনবাবু রাগ করে চলে গেলেন? কেন গেলেন? লুচিতে ঠিকমতো গাওয়া ঘিয়ের ময়ান দেওয়া হয়নি? আলুর দমে কি গরমমশলা ছিল না? বেগুন কি ডুবো তেলে ভাজা হয়নি? না কি ঘন দুধের ওপর পুরু সর ছিল না? কোন ত্রুটিটা ধরে তিনি এমনভাবে বিপিনবাবুকে ভাসিয়ে দিয়ে গেলেন?

বিপিনবাবু খানিকক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলেন, রামভজনবাবু! এ আপনি কী করলেন রামভজনবাবু! আমাকে যে পথে বসিয়ে

দিয়ে গেলেন। সামান্য ক্রটির জন্য সাত ঘড়া মোহর আর সাত কলসি হিরে-জহরত থেকে অধমকে বঞ্চিত করলেন!

কান্নার শব্দে লোকজন সব জেগে উঠে শোরগোল তুলল।

পালিয়েছে ! পালিয়েছে ! ছেলেধরা পালিয়েছে !

কেউ বলল, ওরে দ্যাখ, জিনিসপত্তর কী কী নিয়ে গেল? গোপাল আর গোবিন্দ তেড়েফুড়ে উঠে বলল, আমরা যে পদসেবা করব বলে লাইনে বসে আছি

তুমুল হইহট্টগোল বেধে গেল। তারপর লোকজন টর্চ আর লণ্ঠন নিয়ে চারদিকে খুঁজতে ছুটল। তিন মাসি পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল। সেই চেঁচানোর কোনও মাথামুণ্ডু নেই। যেমন কাশীবাসী মাসি বললেন, কেমন, আগেই বলেছিলুম কি না।

হাসিরাশি মাসি বললেন, আমিও ঠিক টের পেয়েছিলুম গো দিদি!

হাসিখুশি মাসি বললেন, আমি তো তখন থেকে পই-পই করে বলছি

ঠিক এই সময়ে খাটের তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে রামভজনবাবু বেরিয়ে এসে বিপিনবাবুকে বললেন, ওহে, আর দেরি করা ঠিক হবে না। এই সুযোগ "

বিপিন কান্না ভুলে হাঁ করে চেয়ে থেকে অন্ধকারেই বললেন, রামভজনবাবু নাকি! স্বপ্ন দেখছি না তো!

না হে আহাম্মক। এই চালাকিটা না করলে বিপদ ছিল। আর দেরি নয়, তাড়াতাড়ি চলো।

বিপিন লাফিয়ে উঠে পড়ে বললেন, যে আজ্ঞে। সদর খুলে দুজনে বেরিয়ে এলেন। ভজনবাবু বললেন, পথঘাট ধরে যাওয়া ঠিক হবে না। আঘাটা আর খানাখন্দ ধরে চলো হে।

বিপিনবাবুর কোনও আপত্তি হল না। খানিক হেঁটে, খানিক দৌড়ে রামভজনবাবুর গতিবেগের সঙ্গে তাল রাখতে-রাখতে বিপিন বাবু জিজ্ঞেস করলেন,তা জায়গাটা কত দূর হবে মশাই!

দূর কীসের? দুটো গাঁ পেরোলেই মধুবনির জঙ্গল। তারপর আর পায় কে? চলো, চলো, রাত পোয়াবার আগেই জঙ্গলে ঢুকে পড়তে হবে।

সে আর বলতে ! তা রামভজনবাবু, অভয় দিলে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি।

কী কথা?

মোহর নির্য্যস সাত ঘড়াই তো !

একেবারে নির্য্যস।

আর সাত কলসি হিরে-জহরত, তাই না ?

ঠিকই শুনেছ।

মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে ভুল শুনিনি তো !

কিছুমাত্র ভুল শোনোনি। কিন্তু অমন থপ-থপ করে হাঁটলে তো হবে না। দৌড়ও, জোরে দৌড়ও।

যে আজ্ঞে। বলে যথাসাধ্য দৌড়তে-দৌড়তে বিপিন হাপসে যেতে লাগলেন। হাঁফাতে-হাঁফাতে একসময়ে আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলেন, ভজনবাবু! আপনি রক্তমাংসের মানুষ তো !

তা নয় তো কী?

ঠিক তো ভজনবাবু? আমার যে মনে হচ্ছে আপনি মাটির ওপর দিয়ে হাঁটছেন না, কেমন যেন উড়ে উড়ে যাচ্ছেন !

তুমিও উড়বার চেষ্টা করো হে বিপিন। আমার সঙ্গে তাল দিয়ে হাঁটতে না পারলে যে সেখানে পৌঁছতেই পারবে না ।

বলেন কী মশাই, সেখানে না পৌছে ছাড়ার পাত্রই আমি নই। এই যে দেখুন, দৌড়ের জোর বাড়িয়ে দিলুম।

বাঃ বাঃ, বেশ।

আপনার বয়স যেন কত হল ভজনবাবু?

একশো ত্রিশ। তোমার চারগুণেরও বেশি।

কেমন যেন পেত্যয় হয় না। আচ্ছ ভজনবাবু!

বলে ফ্যালো?

আপনি কি একটু-একটু করে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন? আপনার আর আমার মধ্যে তফাতটা যেন বেড়ে যাচ্ছে!

বাপু হে, তফাত তো বাড়বেই। তোমার যে মোটে গা নেই নেই দেখছি, সাত ঘড়া মোহর আর সাত কলসি হিরে-জহরতের কথা একটু ভেবে নাও, গা গরম হয়ে যাবে। তখন দেখবে হরিণের মতো ছুটছ।

যে আজ্ঞে।

ছুটতে-ছুটতে বিপিনবাবু চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। তেষ্টায় বুক যেটে যেতে লাগল। পা আর চলে না। ভজনবাবু যেন ক্রমে ক্রমে দিগন্তে মিলিয়ে যাচ্ছেন। তবু বিপিনবাবু হাল ছাড়লেন না। সাত ঘড়া মোহর আর সাত কলসি মণিমাণিক্যের কথা ভেবেই এখনও শরীরটাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলেছেন।

তবে কষ্টের শেষও হল একসময়ে। একটা মস্ত জঙ্গলের ভেতর ভজনবাবুর পিছু-পিছু ঢুকে পড়লেন বিপিনবাবু। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়ায় মুখে কথা ফুটল না।

ভজনবাবুই দয়া করে বললেন, এসে গেছি হে। আর কিছু দূর এগোলেই আমার আস্তানা। এখন আর ছুটতে হবে না।

বিপিনবাবুর চোখ কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। পুবদিকে ভোরের আলো ফুটি-ফুটি করছে। অন্ধকার পাতলা হয়ে এসেছে। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে এখনও অমাবস্যার অন্ধকার। তার ওপর জঙ্গল এত ঘন যে, এগনো ভারী কষ্টকর। বিপিনবাবু এই অন্ধকারে ভজনবাবুকে একেবারেই দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু ডাকাডাকি করা সম্ভব হচ্ছে না। গলা শুকিয়ে স্বরভঙ্গ হয়ে আছে।

হঠাৎ সামনে থেকে ভজনবাবু লাঠিটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা শক্ত করে ধরে থাকো হে বিপিন, নইলে এ-জঙ্গলে একবার হারিয়ে গেলে ঘুরে-ঘুরে মরতে হবে।

বিপিনবাবু লাঠিটা ধরলেন। কিন্তু ভজনবাবু যত স্বচ্ছন্দে এগোচ্ছেন, বিপিনবাবু লাঠি ধরে থেকেও তা পারছেন না। দুবার লতাপাতায় পা জড়িয়ে পড়ে গেলেন। বড়-বড় গাছের সঙ্গে দুমদাম ধাক্কা খেতে লাগলেন বারবার। কপাল কেটে রক্ত পড়তে লাগল, হাঁটুর ছাল উঠে জ্বালা করছে। বিপিনবাবু তবু অন্ধের মতো লাঠিটা ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল, ভজনবাবু বুড়ো মানুষ তো ননই, আদতে মনিষ্যিই নন। এই বয়সে কারও এত শক্তি আর গতি থাকতে পারে?

কতবার পড়লেন, আরও কতবার গাছে ধাক্কা খেলেন তার আর হিসেব রইল না বিপিনবাবুর। কতক্ষণ এবং কতদূর হাঁটলেন সেটাও গুলিয়ে গেল। শেষ অবধি যখন এই শীতেও শরীরে ঘাম দিল আর হাত-পা একেবারে অসাড় হয়ে এল তখন হঠাৎ ভজনবাবু থামলেন। বললেন, এই দ্যাখো, এই আমার ডেরা।

বিপিনবাবু চোখ মেলে প্রথমটায় শুধু অন্ধকার দেখলেন। খানিকক্ষণ চেয়ে থাকার পর ধীরে-ধীরে আবছাভাবে দেখতে পেলেন, সামনে অনেক গাছ, ঝোপ আর লতাপাতার জড়াজড়ির মধ্যে যেন ভাঙাচোরা একটা বাড়ির আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ, এখন আকাশে বেশ আলো ফুটেছে, কিন্তু এ-জায়গাটা এখনও সন্ধেবেলার মতো অন্ধকার।

ভজনবাবু খুব দয়ালু গলায় বললেন, ওই তোমার বা দিকে ঘাটের সিঁড়ি । পুকুরের জলে হাত-মুখ ধুয়ে নাওগে।

বিপিনবাবু প্রায় ছুটে গিয়ে ঘাটে নেমে প্রথমটায় আজলা করে জল তুলে আকণ্ঠ পিপাসা মেটালেন। তারপর চোখেমুখে ঘাড়ে জল দিয়ে নিজেকে একটু মনিষ্যি বলে মনে হল। যখন উঠে আসছেন তখন বা দিকে একটা অদ্ভুত গাছ নজরে পড়ল তাঁর। বিশাল উচু সরল একটা গাছ, ডালপালা নেই। কিন্তু মগডাল থেকে গোড়া অবধি বড়-বড় পাতায় ঢাকা। এরকম গাছ তিনি জন্মে দ্যাখেননি।

জায়গাটা কেমন যেন ছমছমে, দিনের বেলাতেও কেমন যেন ভুতুড়ে ভাব।

রামভজনবাবু তাঁর বাঁদুরে টুপিটা গতকাল থেকে একবারও খোলেননি। টুপির গোল ফোকর দিয়ে জুলজুলে চোখে বিপিনবাবুকে একটু দেখে নিয়ে বললেন, কেমন বুঝছ হে?

আজ্ঞে, হাত-পায়ে একটু অসার ভাব আছে, বুকটা ধরফড় করছে, মাথাটা ঝিমঝিম, মাজায় টনটন, কানে একটু ঝিঁঝি। হাঁটু দুটো ভেঙে আসতে চাইছে। সর্বাঙ্গে এক লক্ষ ফোড়ার ব্যথা। তা হোক, তবু ভালই লাগছে।

বাঃ বাঃ ; এই তো চাই ! কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায় হে! এসো, এবার ডেরায় ঢোকা যাক।

চারদিকে এত আগাছা আর জঙ্গল হয়ে আছে যে, এর ভেতরে কী করে ঢোকা যাবে তা বুঝতে পারলেন না বিপিনবাবু। কিন্তু রামভজনবাবু ওই বুকসমান জঙ্গলের ফাঁক দিয়েই একটা সরু পথ ধরে ঢুকতে লাগলেন। বিপিনবাবু সভয়ে বললেন, সাপখোপ নেই তো ভজনবাবু?

তা মেলাই আছে। তবে শীতকালে তারা ঘুমোয়। বিপিনবাবু দেখতে পেলেন, সামনে বাড়ি নয়, বাড়ির একটা ধ্বংসস্তুপই পড়ে আছে। শ্যাওলায় কালো হয়ে আছে খাড়া দেওয়ালগুলো। ভজনবাবু ধ্বংসস্তুপটা পাশ কাটিয়ে বা দিক দিয়ে বাড়ির পেছন দিকটায় উঠলেন।

বাড়িটা একসময়ে বেশ বড়সড়ই ছিল, বোঝা যায়। বিপিনবাবু দেখলেন, পেছন দিকে গোটাদুই ঘর এখনও কোনওমতে খাড়া আছে। জরাজীর্ণ দরজা-জানলাগুলি এখনও খসে পড়েনি।

বিপিনবাবু একটু অবাক হয়ে বললেন, এ কী ! দরজায় তালা দিয়ে রাখেননি?

ভজনবাবু দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে-ঢুকতে একটু হাসলেন, তালা দেব কার ভয়ে? এখানে কে আসবে !

সাবধানের মার নেই কি না!

ঘরে ঢুকে বিপিনবাবু দেখলেন, একধারে একখানা নড়বড়ে চৌকিতে একখানা শতরঞ্চি পাতা। একটা বালিশ, আর কম্বল।

ভজনবাবু বললেন, এই তোমার বিছানা।

আমার বিছানা? আর আপনি!

আমার অন্য ব্যবস্থা আছে। এবার এসো, আসল জিনিস দেখবে।

যে আজ্ঞে।

ভজনবাবু পাশের ঘরটাতে ঢুকে মেঝেতে একখানা লোহার গোল ঢাকনা টেনে তুললেন। তলায় গর্ত ।

গর্তের ভেতরে লোহার সিড়ি নেমে গেছে। ভজনবাবু নামতে-নামতে বললেন, এসো হে।

বিগলিত হয়ে বিপিনবাবু বললেন, আসব? সত্যিই আসব? আমার একটু লজ্জা-লজ্জা করছে।

আহা, লজ্জার কী? নিজের জিনিস মনে করে সব বুঝে নাও। তারপর আমার ছুটি।

সত্যি বলছেন তো ভজনবাবু? ছলনা নয় তো!

ওরে বাবা, না। বুক চিতিয়ে চলে এসো

বিপিনবাবু ভজনবাবুর পিছু পিছু সরু লোহার সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে নামলেন। নীচের ঘরটা খুব একটা নীচে নয়। বড় জোর পাঁচ-সাত হাত হবে। বিপিনবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, একটা মৃদু আলোর আভায় ঘরটা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। আলোটা কোথা থেকে আসছে তা দেখতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। ঘরের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড কালো সাপ ফণা তুলে আছে, তারই মাথা থেকে একটা আলো বেরোচ্ছে।

ভজনবাবু বললেন, ভয়ের কিছু নেই। সাপটা পাথরের। আর আলোটা দেখতে পোচ্ছ ওটা সাপের মাথার মণি। আসল সাপের মাথা থেকে এনে পাথরের সাপের মাথায় বসানো হয়েছে।

বিপিনবাবু উত্তেজিত হয়ে বললেন, সে মণির তো লাখো-লাখো টাকা দাম !

কোটি-কোটি টাকা।

ঘরের একধারে পর পর সাতটা ঘড়া, অন্য ধারে পর পর সাতটা কলসি সাজানো।

ভজনবাবু বললেন,হাঁ করে দেখছ কী! যাও গিয়ে ভাল করে মোহরগুলো পরখ করো। এই নাও কষ্টিপাথর। ঘষেও দেখতে পারো।

বিপিনবাবুর হাত-পা কাঁপছিল। স্বপ্ন দেখছেন না তো! নিজের হাতে একটা রামচিমটি কেটে নিজেই উঃ করে উঠলেন। না, স্বপ্ন নয় তো? ঘটনাটা যে ঘটছে!

প্রথম ঘড়া থেকে খুব সঙ্কোচের সঙ্গে একখানা মোহর তুলে দেখলেন তিনি। খাঁটি জিনিস।

দ্যাখো, ভাল করে ফেলে ছড়িয়ে ঘেঁটে দ্যাখো। নইলে মজাটা কীসের? এসব তো ঘেঁটেই আনন্দ!

তা ঘটিলেন বিপিন। নাওয়া-খাওয়া ভুলে সারা সকাল সোনাদানা হিরে-জহরত নাড়াচাড়া করে মনটা যেন স্বর্গীয় আনন্দে ভরে উঠল। ভজনবাবু তাই দেখে খুব হাসতে লাগলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গোবিন্দ ছোঁড়া যে লোক সুবিধের নয় তা কি আর পীতাম্বর জানে না ! কিন্তু ছোঁড়াটার ওপর বড় মায়া পড়ে গেছে পীতাম্বরের। চারদিকে কত গবেট মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে, খাচ্ছে-তাচ্ছে, ফুর্তি করছে, তারা কি কেউ কখনও পীতাম্বরের গন্ধ পায়? না শব্দ পায়? না দেখা পায়? কারও গেরাহ্যিই নেই পীতাম্বরকে। তা এতকালের মধ্যে ওই গোবিন্দ ছোঁড়াই যাহোক একটু দাম তো দিল তার। মায়াটা সেইজন্যই। আর মুশকিলও সেইখানেই, কারণ, গোবিন্দর নানা অপকর্মে তাকে সাহায্য করতে হচ্ছে।

ভজনবাবু যখন মাঝরাতে চালাকি করে বিপিনকে নিয়ে পালাল তখন দিগভ্রান্ত গোবিন্দ আর গোপাল হাটখোলার দিকে ছুটে গিয়েছিল। আর একটু হলেই বিপদ বাধাত। কারণ, নবীন মুদির জ্ঞান ফিরে এসেছে মাঝরাতে। তার চেঁচামেচিতে লোকে এসে দরজা ভেঙে তাকে উদ্ধার করেছে এবং বৃত্তান্ত শোনার পর হাটখোলার লোকেরা এ-দুজনকে ডাণ্ডা হাতে খুঁজে বেড়াচ্ছে চারদিকে।

গোঁয়ারগোবিন্দের মতোই গোপাল আর গোবিন্দ যখন হাটখোলার দিকে যাচ্ছিল তখন শীতলাবাড়ির মোড়ে গোবিন্দ ফট করে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, কে আমাকে ডাকছে বলো তো!

কে ডাকবে?

কেউ যেন ওদিকে যেতে বারণ করছে।

তোর মাথা। আজ কি তোকে ভূতে পেল?

ভুতই হবে। কিন্তু সে উপকারী ভূত। না গোপালদা, ওদিকে যাওয়া ঠিক হবে না।

কিন্তু ভজনবুড়ো যে পালিয়েছে, তার কী হবে? সাত ঘড়া মোহর, সাত কলসি হিরে।

আমার মন বলছে, ভজনবাবু এদিকে যায়নি।

মন বলে কি আমারও কিছু নেই রে? সেও কি কথা কয় না?

শোনো গোপালদা, ফিরে গিয়ে চলো একটু চুপ করে বসি, কেউ আমাকে যেন কিছু বলতে চাইছে।

গোপাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, শেষে তুইও সিদ্ধাই হলি?

গোবিন্দ যে তার কথা শুনতে পাচ্ছে এবং সেইমতো চলছে এতে পীতাম্বর খুব খুশি। পরিশ্রম সার্থক।

দু'জনে ফিরে এসে ফের খড়ের গাদির মধ্যে সেধিয়ে বসার পর পীতাম্বর চারপাশটা দেখে এল। ভজনবুড়ো বিপিনকে নিয়ে মধুবনির জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে তাও পীতাম্বর জানে। এমনকী সাত ঘড়া মোহর আর সাত কলসি মণিমানিক সে দেখেও এসেছে। হায় রে! বেঁচে থাকতে ওসবের সন্ধান পেলে কত ভাল হত!

সে না পাক, এখন গোবিন্দ পেলেও তার দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে। কিন্তু মুশকিল হল ভজনবুড়ো বিপিনকে সব সুলুকসন্ধান দিয়ে ফেলেছে । তাদের কাছ থেকে সব কেড়েকুড়ে নিতে পারবে কি দুধের বাছা গোবিন্দ? বিপিন কৃপণ লোক, কৃপণের ধনসম্পত্তি বাঁচাতে জান লড়িয়ে দেয়। তার ওপর ভজনবুড়ো আছে। যেমন ধূর্ত তেমনই পাষণ্ড, তেমনই গুণ্ডা। গোবিন্দ আর গোপাল তার কাছে দুধের শিশু। পীতাম্বর ভাবিত হয়ে পড়ল।

প্রতিভাবানের লক্ষণ হল তারা কোনও ঘটনাতেই ঘাবড়ে যায় না বা বিভ্রান্ত হয় না। মূল ঘটনা থেকে তারা কখনও মনঃসংযোগও হারায় না। কী ঘটতে পারে বা কী ঘটতে যাচ্ছে সেই সম্পর্কে তাদের দূরদৃষ্টি থাকে। লোকচরিত্র অনুধাবনেও তারা অতিশয় দক্ষ। এতসব গুণ আছে বলেই না আজ দশটা গাঁয়ের দুষ্ট লোকেরা চিতেনকে দেখলে সেলাম ঠোকে।

তবে হ্যাঁ, ভজনবুড়োর মতো ধূর্ত লোককে বিশ্বাস কী? চিতেন যদি ডালে ডালে চলে তো ভজনবাবু চলেন পাতায়-পাতায়। ধুর্তমিতে ভজনবাবু তাকে টেক্কা দিতে পারেন বলে একটা ভয় ছিলই চিতেনের। তাই রাত তিনটের সময় যখন সদর দরজাটা টুক করে খুলে একটু ফাঁক হল, তখনই চিতেন বুঝে গেল, এবার খেল শুরু হচ্ছে।

কিন্তু চালটা ভজনবাবু দিলেন বড়ই সোজা। ভজনবাবুকে খুঁজে না পেয়ে বিপিনবাবু যখন কান্না জুড়লেন এবং লোকজন চারদিকে ভজনবাবুকে খুঁজতে ছুটল তখনও চিতেন অনুমান করল, ভজনবাবু ঘরেই আছেন। কারণ পেছনের দরজায় চিতেন তালা লাগিয়ে রেখেছে। ভজনবাবু তো মশামাছি নন যে জানলার ফাঁক দিয়ে উড়ে যাবেন। তাঁকে এই সদর দিয়েই বেরোতে হবে।

প্রতিভাবানদের আরও গুণ হল, তারা যখন দৌড়য় তখন পায়ের শব্দ হয় না, তারা সহজে হাঁফিয়ে যায় না, শিকারের দিকে তাদের তীক্ষ্ণ নজর থাকে, তারা হোঁচট খেয়ে পড়ে না, বেড়া বা ছোটখাটো দেওয়াল অনায়াসে ডিঙোতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, প্রতিভাবানেরা গা-ঢাকা দিতেও ওস্তাদ। এসব গুণের জন্যই চিতেন ভজনবাবু আর বিপিনদাদার পিছু নিয়ে মধুবনির জঙ্গলে পৌঁছে গেল।

এটুকু আসতেই বিপিনদাদার দম বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু চিতেনের গাও গরম হল না।

জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকার থাকায় আর গাছপালার বাড়বাড়ন্তর ফলে চিতেনের ভারী সুবিধে হয়ে গেল। অন্ধকারে প্রতিভাবানরা ভালই দেখতে পায়, চিতেনও দিব্যি সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল। পিছু নিতে তার কোনও অসুবিধে হল না।

ভজনবাবু যেখানে বিপিনবাবুকে এনে হাজির করলেন সে জায়গাটা মোটেই সুবিধের মনে হল না চিতেনের। ভাঙা বাড়ি, গাছপালা, গহিন বনের নির্জনতা থাকা স্বত্ত্বেও চিতেনের মনে হচ্ছিল, এখানে আরও একটা কোনও ব্যাপার আছে।

পেছন থেকে কে যেন আস্তে করে বলল, আছেই তো। চিতেন সাধারণ ছিচকে চোর হলে চমকাত বা শিউরে উঠত। কিন্তু অতি উঁচুদরের শিল্পী বলে সে স্থির রইল এবং হাসি-হাসি মুখ করে পেছনে তাকাল।

যে-দৃশ্যটা চিতেনের চোখে পড়ল তা দেখে অন্য লোক মুর্ছা যেত। কিন্তু চিতেন অন্য ধাতুতে গড়া বলেই গেল না। পেছনে একটা ছোট গাছের ডালে অনেকটা টিয়াপাখির মতোই একটা পাখি বসে আছে। তবে আকারে অনেক বড়। আর খুবই আশ্চর্যের কথা যে, টিয়াপাখিটার ঠোঁটের নীচে অন্তত ইঞ্চিছয়েক ঘন কালো দাড়ি এবং মাথায় কালো চুল আছে।

চিতেন একটু গলাখাকারি দিয়ে খুব বিনয়ের সঙ্গেই বলল, কথাটা কে বলল?

টিয়াপটিা গাছ থেকে একটা ফল ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে কপ করে গিলে ফেলে বলল,আমিই বললাম, কেন কোন দোষ হয়েছে?

টিয়াপাখি এত স্পষ্ট করে কথা বলতে পারে তা জানা ছিল না চিতেনের।

পাখিটা তার দিকে চেয়ে বলল, আমি যে টিয়াপাখি তা কে বলল তোমাকে?

চিতেনকে ফের উত্তেজনা কমাতে গলাখাকারি দিতে হল। সে বলল, আপনি তবে কী পাখি?

সে তোমার বুঝে কাজ নেই। তোমার মতলব তো জানি। গুপ্তধন খুঁজতে এসেছ তো! যাও, পাবে। অনেক আছে।

চিতেন একটু থতমত খেয়ে বলল, আপনি কি অন্তর্যামী?

পাখিটা হিহি করে হেসে পটাং করে উড়ে গেল। শক্ত ধাতুর চিতেনের মাথাটা একটু ঝিমঝিম করছিল। স্বপ্ন দেখছে নাকি?

কে যেন মাথার ওপর থেকে বলল, না, স্বপ্ন হবে কেন? ঠিকই দেখেছ।

চিতেন ধীরে মুখটা ওপরে তুলে দেখল, একটু ওপরে গাছের ডালে অনেকটা হনুমানের মতো দেখতে একজন বসে আছে। হনুমানই, তবে এরও বেশ দেড়হাত

লম্বা দাড়ি আর বড় বড় বাবরি চুল। মুখে একটু বিদ্রুপের হাসি।

কিছু বুঝলে চিতেনবাবু ?

আজ্ঞে না। মাথা ঝিমঝিম করছে নাকি?

করছে।

তবু বলি বাপু, তুমি বেশ শক্ত ধাতের লোক। তোমার হবে।

কী হবে?

যেমন হতে চাও।

এই বলে হনুমানটা চটপট গাছ বেয়ে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল। ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি? চিতেন নিজেকে সামলাতে একটু চোখ বুজে রইল। তারপর চোখ মেলে সে সেই আশ্চর্য গাছটা দেখতে পেল। সোজা সরল, ডালপালাহীন বিশাল উঁচু গাছ। পাতায় ঢাকা।

এরকম গাছ সে জীবনে দ্যাখেনি। চিতেন চারদিকটা ফের ভাল করে দেখল। না, এ জায়গাটা ভুতুড়েই বটে। তার ক্ষুরধার বুদ্ধি দিয়েও সে কিছু বুঝতে পারছে না।

একটু আগে বিপিনদাদাকে নিয়ে ভজনবাবু ভাঙা বাড়িটার ভেতরে ঢুকেছেন। সেখানে কী হচ্ছে কে জানে! চিতেন খুবই চিন্তিত মাথায় ধীরে ধীরে গাছের আড়াল থেকে বের হয়ে বাড়িটার দিকে এগোতে লাগল। তবে দুটো বিচিত্র অভিজ্ঞতায় তার হাত-পা মগজ আর আগের মতো কাজ করছে না। ধন্দ লাগছে।

একটু এগিয়ে বাড়িটায় ঢুকবার মুখে দাঁড়িয়ে সেই অদ্ভুত গাছটায় হাতের ভর রেখে দাঁড়াতে গেল চিতেন। অমনই সমস্ত শরীরটায় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। চিতেন ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। কী থেকে কী হল সে বুঝতেই পারল না।

কে যেন খুব কাছ থেকে বলে উঠল, অত বুঝবার দরকারটাই বা কী?

চিতেন প্রায় কাঁপতে-কাঁপতে উঠে বসে দেখল, একটা দাড়ি আর চুলওয়ালা খরগোশ, তা হাত দুই লম্বা হবে, তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সামনের দুখানা পায়ে ধরা একটা পেয়ারার মতো দেখতে ফল খাচ্ছে ।

চিতেন আর অবাক হল না। কাহিল গলায় বলল, আপনারা কারা?

বললাম তো, বেশি জেনে কাজ নেই। গুপ্তধন চাই তো! যাও না, ওই সোজা পথে ঢুকে যাও। মেলা মোহর আর হিরে-মুক্তো পেয়ে যাবে। ওসব দেওয়ার জন্যই তো আমরা বসে আছি।

এই বলে খরগোশটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হল। অন্য কেউ হলে চেঁচামেচি করত, দৌড়ে পালাত। কিন্তু প্রতিভাবানরা তা করে না। আর করে না বলেই তো তারা প্রতিভাবান। চিতেন লম্বা, বেয়াড়া গাছটার দিকে একবার ঘাড় তুলে চেয়ে ধীরে-ধীরে বাড়ির ভেতরে ঢুকতে লাগল।

ওদিকে বিপিনবাবুর বাড়িতে খড়ের গাদির মধ্যে গোপাল আর গোবিন্দর কী হল সেটাও দেখা দরকার। ভোররাতে খড়ের ওম পেয়ে দুজনেই একটু ঝিমোচ্ছিল। হঠাৎ গোবিন্দ শুনতে পেল, কে যেন খুব ক্ষীণ গলায় বলছে, পাখি সব করে রব, রাতি পোহাইল, কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল... ওঠে শিশু মুখ ধোও পরো নিজ বেশ, আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ..রবিমামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ওই... ভোর হল দোর খোলো, খুকুমণি ওঠে রে...আজি এ প্রভাতে রবির কর কেমনে পশিল প্রাণের পর.

গোবিন্দ রক্তচক্ষু মেলে বিরক্তির সঙ্গে বলল, কে রে এত ভ্যাজরং ভ্যাজরং করে!

পীতাম্বর গোবিন্দর ঘুম ভাঙানোর জন্য ভোর নিয়ে যত কবিতা জানা ছিল আউড়ে যাচ্ছিল এতক্ষণ, কাজ হল না দেখে সে এবার গান ধরল। মুশকিল হল, তার গানের গলা তখনও ছিল না, এখনও নেই। বেসুরো গলাতেই সে প্রভাতী গাইতে লাগল, প্রভাত যামিনী, উদিত দিনমণি, উষারানী হাসিমুখে চায় রে, জাগি বিহগ সব করে নানা কলরব, হরি হরি হরি গুণ গায় রে...

গোবিন্দ এবার উঠে বসে বলল, উঃ, এ যে জ্বালিয়ে খেলে দিলে সকালের ঘুমটার বারেটা বাজিয়ে বেসুরো গলায়।

পীতাম্বর বেশ রাগের গলাতেই ধমক দিল, শোনো হে বাপু, ছেলেবেলায় রচনার বইতে পড়োনি, যে শুইয়া থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে?

এবার গোবিন্দ সটান হয়ে বসল, এ তো সেই গলা ! এ যে তার উপকারী ভূত।

শশব্যস্তে গোবিন্দ বলল, কী করতে হবে আজ্ঞে?

শিগগির রওনা হয়ে পড়ো। ওদিকে সব সোনাদানা যে হরির লুট হতে যাচ্ছে! কবিতায় পড়েনি, ছুটে চল, ছুটে চল ভাই, দাঁড়াবার সময় যে নাই? ঠিক সেইরকম এখন দম ধরে সোজা ছুটে মধুবনের জঙ্গলে গিয়ে সেধোও, তারপর আমি যেমন বলে দেব তেমনই চলবে।

যে আজ্ঞে।

গোবিন্দ গোপালকে ঠেলে তুলে বলল, চলো গোপালদা, আর সময় নেই। সোনাদানা যদি বেহাতি করতে না চাও তো দৌড়ও।

খড়ের গাদি থেকে নেমে দুজনেই রওনা হয়ে পড়ল। কখনও ছুটতে লাগল, কখনও হাঁটতে লাগল। একটু হাপসে পড়লেও দু'জনেই ভোরের আগেই মধুবনির জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।

গোপাল বলল, এবার?

গোবিন্দ হাত তুলে বলল, দাঁড়াও, কথা বোলো না। তেনার গলার স্বরটা শুনতে দাও।

কার গলার স্বর?

সে আছে

তোকে ভূতেই পেয়েছে রে গোবিন্দ।

সে তো পেয়েছেই। ভূতের দয়াতেই আমার সব হবে, ভগবানের দয়া তো আর পাইনি।

পীতাম্বর চারদিকটা দেখে নিয়ে বলল, সোজা চলো।

গোবিন্দ জঙ্গল আর আগাছা ঠেলে এগোতে-এগোতে বলল, আমার পিছু-পিছু এসো গোবিন্দদা, তিনি পথ দেখাচ্ছেন।

বেঘোরে মরব না তো রে গোবিন্দ? দেখিস ভাই।

পীতাম্বর বলল, বটগাছটা পেরিয়ে ডাইনে।

গোবিন্দ যে আজ্ঞে বলে ডাইনে মোড় নিল।

এবার ফের ডাইনে।

যে আজ্ঞে।

এবার বাঁয়ে।

ঠিক আছে।

গভীর জঙ্গলের নিকষ্যি অন্ধকারে আন্দাজে হাঁটতে হাঁটতে গোপাল বলল, আর কি ফিরতে পারব রে গোবিন্দ?

কথা নয়! কথা নয়! তেনার গলার স্বর শুনতে দাও।

পীতাম্বর হঠাৎ বলে উঠল, সামনে বিপদ!

কীসের বিপদ?

ওই যে ফাঁকা জমি দেখা যাচ্ছে, ওইখানে ! আমাকে একটু গা-ঢাকা দিতে হচ্ছে বাপু। এক ছুটে পার হয়ে যাও জায়গাটা।

জঙ্গলের মধ্যে ফাঁকা জায়গাটায় পা দিয়েই দুজন থমকে দাঁড়াল। সামনে তিনজন খুনখুনে ডাইনিবুড়ি দাঁড়িয়ে। তাদের মাথার চুল পা পর্যন্ত নেমেছে, পরনে ময়লা কাপড়, ফোকলা মুখে তিনজনই খুব হিহি করে হাসছে।

প্রথম বুড়ি খনখনে গলায় বলে উঠল, আয় রে আমার গোপাল, আয় রে আমার গোবিন্দ...

দ্বিতীয় বুড়ি বাঁশির মতো তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আয় রে আমার সোনা, আয় রে আমার মানিক...

তিন নম্বর বুড়ি কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, আয় রে আমার রাজা, আয় রে আমার গজা...

আতঙ্কিত গোপাল বলল, পালা গোবিন্দ !

না গোপালদা, না। তিনি বলেছেন, ছুটে পার হতে হবে। এসো, ছুট লাগাই।

দু'জনে প্রাণপণে ছুটে তিন ডাইনিকে ভেদ করে ফের জঙ্গলে গিয়ে পড়ল।

পীতাম্বর বলল, শাবাশ ! এই তো এসে গেছি আমরা। ওই যে ভাঙা বাড়ি দেখা যাচ্ছে, যাও ওর মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ো।

যে আজ্ঞে।

ভাঙা বাড়ির মাটির নীচেকার ঘরে মোহর আর হিরে আর মুক্তে ঘাঁটতে ঘাঁটতে আত্মহারা বিপিনবাবু বললেন, আহা, কী সরেস জিনিস!

ভজনবাবু প্রশান্ত গলায় বললেন, কষ্টিপাথরে ঘষে দেখেছ তো!

যে আজ্ঞে। খাঁটি সোনা। সবই কি আমাকে দিচ্ছেন ভজনবাবু! দু-চারখানা নিজের জন্য রাখবেন না ?

না হে, না। ও নিয়ে আমার আর কী হবে? এবার আমার ছুটি।

তা ভজনবাবু, মোহর আর হিরেগুলো কয়েকখানা একটু বাইরে নিয়ে গিয়ে রোদের আলোয় দেখি!

ভজনবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, দেখবে? তা দ্যাখো। তোমারই সব জিনিস, যা খুশি করতে পারো। তবে কিনা বাপু, যেখানকার জিনিস সেখানেই থাকা ভাল।

একটু দেখেই রেখে দেব এসে।

চলো, আমিও যাচ্ছি।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসে বিপিনবাবু মোহরগুলো দিনের আলোয় দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। কোথায় মোহর? এ যে সিসে। আর হিরের বদলে কিছু পাথরকুচি!

বিপিনবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, ভজনবাবু! এ কী

ভজনবাবু প্রশান্ত মুখে বললেন, বললুম তো, যেখানকার জিনিস সেখানেই মানায় ভাল। ওপরে আনার দরকারটা কী তোমার?

দরকার নেই? বলেন কী?

তুমি হলে কৃপণ লোক, এসব তো প্রাণে ধরে খরচ করবে না কখনও, সুতরাং ওপরে আনারও দরকার নেই। নীচের ঘরে নিয়ে গেলেই দেখবে, ওই সিসেগুলো ফের খাটি মোহর হয়ে গেছে, পাথরগুলো হয়ে গেছে হিরে। এখন থেকে তুমি নীচের ঘরে বাস করলেই তো হয়।

কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বিপিনবাবু ক্ষীণ গলায় বললেন, মোহর সিসে হয়ে যাবে কেন মশাই?

সে তুমি বুঝবে না। কিন্তু আসলে মোহরের সঙ্গে সিসের কোনও তফাত নেই। ভেতরের গুণ একটু বদলে দিলেই হয়। যাও বিপিন, নীচে যাও। মোহর আর হিরে

আর কখনও বাইরে এনে না।

বিপিনবাবু তেমনই ভ্যাবাচাক মুখ করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে দেখলেন, তাঁর এক হাতে মোহর আর অন্য হাতে হিরে ঝলমল করছে।

ব্যাপারটা কী হল তা অবাক হয়ে ভাবছিলেন বিপিনবাবু, ঠিক এই সময়ে হঠাৎ একটা হুহুঙ্কার ডাক ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে মূর্তিমান গোবিন্দ আর গোপাল নীচে নেমে এল । দু'জনের হাতেই মস্ত ছোরা।

বিপিনবাবু সঙ্গে-সঙ্গে রুখে দাঁড়ালেন, খবরদার। আমার সোনাদানায় হাত দিয়েছ কি কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে।

গোপাল আর গোবিন্দ দুজনেই বিপিনের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে ছোরার বাট দিয়ে কয়েক ঘা মোক্ষম বসিয়ে দিতেই বিপিনবাবু জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

তারপর আর কলবিলম্ব না করে দুজনেই ঘড়া আর কলসির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পীতাম্বর হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলল,বেশি লোখ করিসনি, এক-একজন এক-এক ঘড়া মোহর আর এক-এক কলসি হিরে তুলে নে।

গোবিন্দ বলল, যে আজ্ঞে।

সোনার পেল্লায় ওজন। ঘড়া তুলে ওপরে এনে ফেলতে দুজনেই গলদঘর্ম হয়ে গেল। কলসিরও ওজন বড় কম নয়। তোলার পর দুজনেই হ্যাঃ হ্যাঃ করে হাঁফাতে লাগল।

গোপাল বলল, একটু জিরিয়ে নিই। তারপর রওনা হওয়া যাবে, কী বলিস! পরে এসে বাকি ঘড়াগুলো একে একে নিয়ে যাব।

গোবিন্দ কথাটার জবাব দিল না। সরু চোখে সে ঘড়ার দিকে চেয়েছিল। হঠাৎ বলল, এ কী?

গোপালও দেখল। বলল, অ্যাঁ! এ তো সিসে!

হিরেমুক্তোই বা কোথায়? এ তো পাথরকুচি দেখছি! দু'জনেই হাঁ করে চেয়ে ছিল। নিঃশব্দে চিতেন এসে সামনে দাঁড়াল, গম্ভীর গলায় বলল, যাও বাপু, যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে এসো ! নইলে বিপদে পড়বে।

হাঁ করে চিতেনের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে গোবিন্দ বলল, কী ব্যাপারটা, বলো তো!

মাথা নেড়ে চিতেন বলল, আমিও জানি না। তবে এটা বুঝতে পারছি, এ খুব সোজা জায়গা নয়।

পীতাম্বর গোবিন্দর কানে-কানে বলল, ও যা বলছে তাই করো বাপু। খামোখা বিপদ ডেকে এনে না। এখানকার কারবারটা আমিও বুঝতে পারছি না।

গোপাল আর গোবিন্দ কেমন যেন ক্যাবলার মতো কিছুক্ষণ বসে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠল । ঘড়া আর কলসি বয়ে নীচে নিয়ে গিয়ে জায়গামতো রেখে দিল।

বিপিনবাবু উঠে বসে মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে উঃ, আঃ করছিলেন। চিতেন গিয়ে তাঁকে ধরে তুলে বলল, বাড়ি চলুন বিপিনদাদা, অনেক হয়েছে।

কিন্তু মোহর! হিরে মুক্তো!

চিতেন হাসল, কোথায় মোহর! ও তো চোখের ভুল ছাড়া কিছু নয় ! এই ঘরের বাইরে নিলেই মোহর যে সিসে।

তা হলে !

ওপরে চলুন বিপিনদাদা। ভজনবাবু চলে যাচ্ছেন, তাঁকে বিদায় জানাতে হবে।

ভজনবাবু কোথায় যাচ্ছেন?

যেখান থেকে এসেছিলেন, আকাশে।

চিতেনই সবাইকে নিয়ে এসে সেই কিন্তুত প্রকাণ্ড লম্বা গাছটার কাছাকাছি দাঁড়াল। সবাই হাঁ করে দেখল, জঙ্গল ভেদ করে প্রথমে এল তিনটে ডাইনি বুড়ি। তারপর দাড়িওলা খরগোশ, হনুমান, অদ্ভুত টিয়াপাখি। সেই বিশাল গাছটার গোড়ার কাছে হঠাৎ একটা দরজা ধীরে-ধীরে খুলে গেল। ডাইনি বুড়ির পিছু পিছু অদ্ভুত জীবজন্তুরা ভিতরে ঢুকে গেল।

তারপর একটা ঝোপের আড়াল থেকে ভজনবাবু বেরিয়ে এলেন। একই পোশাক, বাঁদুরে টুপিতে মুখখানা ঢাকা। তাদের দিকে চেয়ে ভজনবাবু একটু করুণ হাসলেন। তারপর ধীরে ধীরে ঢুকে গেলেন ভিতরে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

হঠাৎ চারদিকে গাছপালায় একটা আলোড়ন তুলে গোঁ-গোঁ আওয়াজ উঠল। সবাই অবাক হয়ে দেখল, লম্বা গাছটা মাটি ছেড়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে। প্রথমে ধীরে, তারপর হঠাৎ তীরের মতো ছিটকে লহমায় আকাশের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

বিপিনবাবু কাঁপা গলায় বললেন, ভজনবাবু আসলে কে রে চিতেন?

কে জানে! তবে মনে হয়, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে ইনিও একজন কেউ হবেন। চলুন, ভজনবাবুকে এখানেই মাটিতে মাথা ঠুকে একটা পেন্নাম করি।

সঙ্গে-সঙ্গে ধড়াস ধড়াস করে সবাই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল। গোপাল চোখের জল মুছে বলল, গোবিন্দ, আর নয় রে, আর গণ্ডগোলের জীবনে যাব না।

যা বলেছ গোপালদা।

বিপিনবাবু চোখের জল মুছে বললেন, এবার থেকে রোজ গাওয়া ঘিয়ের লুচি খাব রে চিতেন।

হ্যাঁ। আর আমাকেও চুরি ছেড়ে অন্য লাইন ধরতে হবে।

হ্যাঁ, যে-কথাটা বলা হয়নি তা হল, মধুবনির জঙ্গলে সেই সাত ঘড়া মোহর আর সাত কলসি মণিমানিব কিন্তু আজও পড়ে আছে। কিন্তু সে-কথা আর কেউ ভুলেও উচ্চারণ করে না।

*** সমাপ্ত ***

অদ্ভুতুড়ে সিরিজ
বিপিনবাবুর বিপদ
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়